সম্পাদকীয়

# আদর্শিক অবস্থানের পরিবর্তন ছাড়া সংকট নিরসন অসম্ভব

ভয়াবহ এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে বাংলাদেশ। একের পর এক চলছে গুপ্ত হত্যা। এটা কোনো সাধারণ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নয়, বরং মতবাদগত সন্ত্রাস। হত্যাকাণ্ডের পর দায় স্বীকার করা হচ্ছে বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। এর দায়ভার একে অপরের উপর চাপাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। একই কায়দায় চলছে হত্যাকাণ্ডগুলো, তাই ধারণা করা হচ্ছে কোনো কোনো তৃতীয় পক্ষ এরই মাঝে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে নিচ্ছে, কারণ দায় গিয়ে পড়বে জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর উপর। এমনি নানাভাবে মাত্রা নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আজকের সিদ্ধান্ত কাল ভুল মনে হচ্ছে। আসলে ঘূর্ণিবাত্তা যখন আঘাত হানে তখন তার কোনো দিক থাকে না, সে চতুর্দিক থেকে আঘাত হানে। ষাঁড় যখন উন্মত্ত হয়ে যায় তখন ডানে বামে কিছুই অক্ষত রাখে না। তখন সবাই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। তার কবলে প্রাণ হারাচ্ছে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, শিয়া পুরোহিত, ইসলামবিদ্বেষী লেখক, প্রকাশক, সমকামী, নিরীহ নারী, বৃদ্ধ সকলে। তাই এই হামলার মাত্রা নির্ধারণ করা যাবে না। মোট কথা ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেছে এক আসুরিক শক্তি, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। এই আসুরিক শক্তিকে জন্ম দিয়েছে পশ্চিমা সভ্যতা আর ধর্মব্যবসায়ী আরববিশ্ব। তারা এখন হন্যে হয়ে কেবল রণক্ষেত্র খুঁজছে, নিত্য-নতুন টার্গেট খুঁজছে। একটাই লক্ষ্য- সব ধ্বংস করতে হবে। এই যখন তাদের লক্ষ্য তখন কোনোভাবেই এটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। বিরাট একটি জগগোষ্ঠী আছে যারা এই আসুরিক শক্তির পূজা করছে, একে সমর্থন দিচ্ছে। সরকারবিরোধী গোষ্ঠী চায় যে কোনো ভাবেই হোক সরকার বিপাকে পড়ুক, সেটা যদি বৈদেশিক পরাশক্তিগুলোর আগ্রাসনের দ্বারা হয় তাতেও তাদের আপত্তি নেই। এদিকে সরকার নিরুপায় হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্যকে বশে রাখার জন্য তাদের তোষণ নীতি নিয়েছে। সমাজের 'সারা অঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দিব কোথা' অবস্থা। কেউ অর্থ পাচার করছে, কেউ খাদ্যে ভেজাল মেশাচ্ছে, কেউ আমলা হয়ে কুমিরের মতো দেশটাকে গিলে খাচ্ছে, অবাধে চলছে গ্রেফতার বাণিজ্য। আর এ সবকিছুই ধর্মহীন, আত্মাহীন পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতাকে ধারণ করার অনিবার্য পরিণতি। যতক্ষণ না মানুষ চিরন্তন সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ হবে, সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে ততক্ষণ সব কথা, সব প্রচেষ্টা, সব ধরপাকড় ব্যর্থ। সরকার অপরাধ ও সন্ত্রাস দমনের চেষ্টা চালাতেই থাকবে কিন্তু পাল্টা শক্তিশালী আদর্শ দিয়ে মানুষের মানসিক আদর্শিক অবস্থার পরিবর্তন আনতে না পারলে দিন দিন পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হবে। এটা অনিবার্য।

## সূচিপত্র


- সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড: কীসের ইঙ্গিত?- ২
- সাম্প্রতিক গুপ্ত হত্যা ও পুলিশি অভিযান: সমাধানের পন্থা নির্ধারণের আগে প্রয়োজন সমস্যার উৎস অনুধাবন- ৩
- সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিরা কী চায়?- ৫
- গুজব রটিয়ে স্মরণকালের পৈশাচিক বর্বরতা: সোনাইমুড়ির জোড়া খুন- ৬
- ঈমান নামক মহাশক্তির অপব্যবহার রোধ করার উপায়- ১০
- চোখ ডলে নিন- ১২
- দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ কেন ও কীভাবে?- ১৩
- নক্ষত্রের বিদায়: চলে গেলেন মোহাম্মদ আলি- ১৫
- ডোনাল্ড ট্রাম্প: বিতর্কিত মন্তব্যই যার বড় অস্ত্র- ১৮
- জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় সবাইকে 'সাহায্য' করতে উদগ্রীব যুক্তরাষ্ট্র! কিন্তু তাদেরকে সাহায্য করবে কে?- ২০
- সনাতনধর্মীদের অস্তিত্ব রক্ষায় মোদির হস্তক্ষেপ কামনা কতটুকু যৌক্তিক?- ২১
- পবিত্র কোর'আন ও রসুলাল্লাহ (স.) -এর নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব এবং জাতির বর্তমান অবস্থা- ২৩
- বিশ্বনবী (সা.) রেগে লাল হয়ে যেতেন কেন? - ২৪
- মুসলিম উম্মাহর বর্তমান দুরবস্থার প্রকৃত কারণ তওহীদ থেকে বিচ্যুতি- ২৬
- সওম পালন কি অর্থবহ হচ্ছে?- ২৮
- 'বিস্ময় বোলার' মুস্তাফিজ- ৩০


প্রকাশক ও সম্পাদক: এস এম সামসুল হুদা ১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মানিকগঞ্জ প্রেস, ৪৪ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। উপদেষ্টামণ্ডলী: মসীহ উর রহমান, উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী, রুফায়দাহ পন্নী, বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়: ২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ০২-৭২১৮১১১, ০২-৮১১৯০৭৬, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪, বিজ্ঞাপন বিভাগ: ০১৮১৬৭১২১৫৮ ওয়েব: www.bajroshakti.com ই-মেইল: bajroshakti@gmail.com

এসপি বাবুল আক্তারের স্ত্রী মাহমুদা খানম

পুলিশ সদস্য ইব্রাহীম মোল্লা

অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিকী

হিন্দু দর্জি নিখিল চন্দ্র জোয়ার্দার

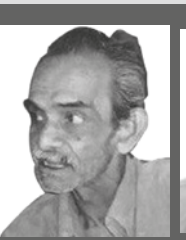

খ্রিষ্টান ব্যবসায়ী সুনীল গমেজ

পুরোহিত আনন্দ গোপাল গাঙ্গুলী

সেবাশ্রমের সেবক নিত্যরঞ্জন পাণ্ডে

## সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড

# কীসের ইঙ্গিত?

আসাদ আলী

যে মুহূর্তে বসে নিবন্ধটি লিখছি, তখন খবর পেলাম মাদারীপুরে আজও একজন হিন্দুধর্মাবলম্বী শিক্ষককে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। এর আগে গুপ্ত হত্যা রোধে দেশব্যাপী পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান শুরুর প্রথম দিন পাবনায় কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল এক সনাতন ধর্মাবলম্বীকে। গত প্রায় দেড় বছর ধরে বাংলাদেশে ক্রমাগত ব্লগার, প্রকাশক, 'নাস্তিক', সমকামী, ভিন্নধর্মী ও ভিন্নমতের মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, যার প্রায় সবগুলো ঘটনারই দায় স্বীকার করেছে কোনো না কোনো জঙ্গিগোষ্ঠী, বিশেষ করে বারবার উঠে এসেছে আইএস ও আল কায়েদার নাম। কিন্তু সরকার বরাবরই তা অস্বীকার করে এসেছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে চলা গুপ্ত হত্যাগুলোকে বারবার সরকারের পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা লক্ষ করা গেছে। এ নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে প্রচুর। তবে সরকার বলে আসছে, দেশকে নিয়ে দেশি-বিদেশি মহলের ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্রে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার জড়িত থাকার কথাও বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ একটি সংবাদ।

গত কয়েক বছর ধরে প্রত্যেকটি গুপ্তহত্যার পরেই হয় আইএস বা আল কায়েদার পক্ষ থেকে দায় স্বীকারের খবর পাওয়া গেছে, নয়ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো না কোনো ইসলামপন্থী গোষ্ঠীকে সন্দেহ করা হয়েছে। এসব ঘটনা আন্তর্জাতিক মিডিয়াতেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ সম্পর্কে কার্যত এমন একটি অনাকাঙ্ক্ষিত বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে বিশ্ব দরবারে যা নিয়ে শঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

২০১৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বইমেলা চলাকালে খুন হন মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ রায়। হামলার দায় স্বীকার করে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম। এরপর ৩০ মার্চ তেজগাঁও এলাকায় চাপাতির কোপে প্রাণ হারান ব্লগার ওয়াশিকুর বাবু। এরও দায় স্বীকার করে আনসারুল্লাহ। ১২ মে দায় স্বীকার মতে একই সংগঠনের হাতে সিলেটে খুন হন ব্লগার অনন্ত বিজয় দাস। ৭ আগস্ট ঢাকায় হত্যা করা হয় ব্লগার নীলয় নীলকে। এর দুইদিন পর নীলফামারীতে শিক্ষক মানবচন্দ্র রায়কে ইজি বাইকের মধ্যে হত্যা করে জেএমবি। ২৮ সেপ্টেম্বর গুলশানে ইতালির নাগরিক তাভেল্লা সিজারকে হত্যা করা হয়, যার দায় স্বীকার করে আইএস। এর কয়েকদিনের

মাথায় ৩ অক্টোবর রংপুরে জাপানি নাগরিক কুনিও হোসিকে হত্যার দায় নেয় আইএস। ৬ অক্টোবর আধ্যাত্মিক নেতা খিজির খানকে হত্যা করা হয়। ২২ অক্টোবর গাবতলিতে পুলিশ চেকপোস্টে হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয় পুলিশ সদস্য ইব্রাহীম মোল্লাকে। এই

হামলারও দায় স্বীকার করে আইএস। এরপর ২৪ অক্টোবর শিয়াদের তাজিয়া মিছিলে বোমা হামলায় নিহত হয় একজন। ৩১ অক্টোবর 'জাগৃতি'র প্রকাশক আরেফিন ফয়সাল দীপন এবং 'শুদ্ধস্বর' এর প্রকাশক টুটুলের উপর হামলা চালানো হয়, এতে দীপন নিহত হন। হামলার দায় স্বীকার করে আনসার আল ইসলাম। এরপর ১০ নভেম্বর রংপুরে এক মঠাধ্যক্ষকে জবাই করে হত্যা, ২৬ নভেম্বর বগুড়ায় শিয়া মসজিদে গুলি করে মুয়াজ্জিন হত্যা এবং ২৫ ডিসেম্বর রাজশাহীর বাগমারায় আহমদিয়া সম্প্রদায়ের একটি মসজিদে আত্মঘাতি বোমা হামলায় একজন নিহত ও দশজন আহত হয়। এই সবগুলো হামলার দায় স্বীকার করে আইএস।

চলতি বছর এই গুপ্তহত্যার হার আরও বেড়েছে। ২০১৬ সালের ৭ জানুয়ারি ঝিনাইদহে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছামির উদ্দিন মণ্ডল হত্যা, ২১ ফেব্রুয়ারি পঞ্চগড়ে যজ্ঞেশ্বর রায় নামের হিন্দু পুরোহিতকে গলা কেটে হত্যা ও ১৪ মার্চ ঝিনাইদহে শিয়া ধর্ম প্রচারক আব্দুর রাজ্জাক হত্যার দায় স্বীকার করে আইএস। ৬ এপ্রিল গণজাগরণ মঞ্চের কর্মী ও অনলাইন এক্টিভিস্ট নাজিমুদ্দিন সামাদকে হত্যা করে দায় স্বীকার করে আনসার আল ইসলাম। এরপর ২৩ এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিকীকে নিজ বাসার সামনে জবাই করে হত্যা করা হয় যার দায় নেয় আইএস। এর দুই দিন পর ২৫ এপ্রিল ঢাকার সমকামী বিষয়ক পত্রিকা রূপবানের সম্পাদকসহ দুই জনকে হত্যা করা হয়। হত্যার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দেয় আনসার আল ইসলাম। ৩০ এপ্রিল জবাই করে নিখিল চন্দ্র জোয়ার্দার হত্যা, ৭ মে রাজশাহীর তানোরে একজন পীরকে জবাই করে হত্যা এবং ১৪ মে বান্দরবানে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে জবাই করে হত্যা করা হয়। এরপর ২০ মে কুষ্টিয়ায় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হত্যা, ৫ জুন চট্টগ্রামে পুলিশ সুপার (এসপি) বাবুল আক্তারের স্ত্রী মাহমুদা খানমকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা এবং একইদিনে নাটোরে খ্রিষ্টান ব্যবসায়ী সুনীল গমেজকে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জবাই করে হত্যা করা হয়। সুনীল হত্যার দায় স্বীকার করে আইএস। সবশেষ ৭ জুন ঝিনাইদহে বৃদ্ধ পুরোহিত আনন্দ গোপাল গাঙ্গুলীকে এবং ১০ জুন পাবনা সদর উপজেলার হেমায়েতপুরে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র সৎসঙ্গ সেবাশ্রমের সেবক নিত্যরঞ্জন পাণ্ডেকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় দায় স্বীকার করে আইএস। পরিসংখ্যান বলে দিচ্ছে, টার্গেট কিলিং প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে।

জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদকে কেন্দ্র করে সিরিয়া-ইরাক আজ এক অভিশপ্ত ভূ-খণ্ডে পরিণত হয়েছে এটা সবার জানা। আফগান-লিবিয়া ধ্বংস হয়েছে। পাকিস্তানের মাটিতে এখনও বইছে অসহিষ্ণুতার বিষবাষ্প। জঙ্গিবাদ দমনের নামে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের প্রহসন আরও ভয়ংকর। সাম্রাজ্যবাদীদের কথিত জঙ্গি দমনের খেসারত দিতে গিয়ে মাটির সাথে মিশে গেছে লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ আদম সন্তানের প্রাণহীন ক্ষত-বিক্ষত দেহ। আজকে ঘর হারিয়ে, দেশ হারিয়ে ইরাক-সিরিয়ার কোটি কোটি মানুষ শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করছে, সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে, ইউরোপের ফুটপাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজছে। এমন একটি অবস্থায় আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে পড়েছে জঙ্গিবাদের অশুভ ছায়া। টার্গেট করে করে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। একেকটি হত্যাকাণ্ড ঘটছে, আর পশ্চিমা গণমাধ্যম উঠেপড়ে লাগছে বাংলাদেশে আইএস বা জঙ্গিবাদের উপস্থিতি প্রমাণ করতে। সরকারের প্রতি চাপ আসছে আইএসের উপস্থিতি স্বীকার করে নিতে। আর মুখে মধু অন্তরে বিষ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বারবার প্রস্তাব করছে জঙ্গি দমনে সহোযোগিতার।

এসপির স্ত্রীকে হত্যা এই উত্তেজনাময় পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। পুলিশ-পরিবারের উপর হামলা হওয়ায় পুলিশ বিষয়টিকে বিশেষভাবে নিয়েছে। শুরু হয়েছে দেশব্যাপী সাঁড়াশি অভিযান। পুলিশ কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণাও দিচ্ছেন। কথিত বন্দুকযুদ্ধে বেশ ক'জন 'জঙ্গি' প্রাণ হারানোর ঘটনায় বিশ্লেষকরা পরিস্থিতির জটিলতা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। একদিকে দেশি-বিদেশি ইন্ধনে ক্রমাগত গুপ্তহত্যা, জঙ্গিবাদের উত্থান, ক্ষুব্ধ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর 'অল আউট ওয়ার' ঘোষণা, সরকারের জনবিচ্ছিন্নতা; অন্যদিকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী চক্র ও তাদের তল্পিবাহক মিডিয়ার অবিশ্রান্ত প্রোপাগান্ডা- এসব কীসের আলামত?

---

সাম্প্রতিক গুপ্ত হত্যা ও পুলিশি অভিযান

# সমাধানের পন্থা নির্ধারণের আগে প্রয়োজন সমস্যার উৎস অনুধাবন

মোখলেছুর রহমান সুমন

চট্টগ্রামে পুলিশ কর্মকর্তা বাবুল আক্তারের স্ত্রী মাহমুদা খানম মিতু খুন হওয়ার পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে গুপ্ত হত্যা দমনে যে তৎপরতা দেখা গেছে, অতীতে অনুরূপ বহু ঘটনা ঘটলেও ততটা দেখা যায়নি। এই মর্মান্তিক ঘটনার পরই পুলিশের আইজির পক্ষ থেকে আগাম ঘোষণা আসে, টানা এক সপ্তাহ চলবে 'সাঁড়াশি অভিযান'। তারও আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের আইডিতে একজন পুলিশ কর্মকর্তা ঘোষণা দিয়েছিলেন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে আর 'কাজ' করবেন না তিনি, করবেন 'যুদ্ধ'। সাঁড়াশি অভিযান শুরু হওয়ার আগেই পুলিশ ও র‍্যাবের সাথে কথিত বন্দুকযুদ্ধে পটাপট ৭ জন নিহত হয়। এ নিয়ে ব্যাপক গুঞ্জন, আলোচনা, সমালোচনা চলছে। এদিকে সপ্তাহব্যাপী অভিযানের প্রথম পাঁচ

দিনে ১১ হাজারের বেশি ব্যক্তিকে আটক করা হয়, যাদের মধ্যে মাত্র ১৯৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় জঙ্গি সন্দেহে। পরের দুইদিনে আটক সংখ্যার পূর্ণাঙ্গ কোনো হিসাব পুলিশ দেয়নি। আটকদের মধ্যে অল্প কিছু সন্দেহভাজন জঙ্গি ছাড়া বাকিদের অধিকাংশ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী যাদের বিরুদ্ধে 'নাশকতা'র এক বা একাধিক মামলা রয়েছে। এমতাবস্থায় এই "সাঁড়াশি অভিযান" এর উদ্দেশ্য ও সফলতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেছে। বলা হচ্ছে, উর্ধ্বতনদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, সাধারণ পুলিশ সদস্যদের জন্য এই অভিযানের সুযোগে দেশব্যাপী বিরোধী দলীয় নেতাকর্মী থেকে শুরু করে ছিচকে চোর, এমনকি নিরপরাধ মানুষদের ব্যাপক ধর-পাকড়ের মধ্য দিয়ে আরেক দফা গ্রেপ্তার-বাণিজ্যের পথ খুলে গেছে যায়।

এদিকে চট্টগ্রামে পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রীকে হত্যা করা যে ইসলাম বহির্ভূত ছিল এই ব্যাপারে ফতোয়া দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছে আনসার আল ইসলাম নামে জঙ্গি সংগঠনটি যারা সাম্প্রতিক বেশ কিছু হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে। এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে সংগঠটি মূলত মিতু হত্যায় নিজেদের দায়মুক্তির চেষ্টা করেছে। যদিও ওই হত্যাকাণ্ডে দায় স্বীকার করেনি কোনো সংগঠনই। তথাপি হামলার ধরন, হামলাকারীর সংখ্যা, পরিবহন ইত্যাদি বিবেচনায় এটা পরিষ্কার যে এটা একই গোষ্ঠীর কাজ। যা হোক, হত্যাকাণ্ডটি যারাই ঘটিয়ে থাকুক, পুলিশের ভাষায় 'সফট টার্গেট', তথ্যমন্ত্রীর ভাষায় 'নরম লক্ষ্যবস্তু' অর্থাৎ নির্দোষ-নিরপরাধ, নির্বিবাদী সাধারণ মানুষ, যারা কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, তারাই যখন অস্ত্রের নিশানায় পরিণত হচ্ছেন, তখন স্বাভাবিক জ্ঞানেই বোঝা যায়, পরিস্থিতি খুব ভয়াবহ। রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন ইত্যাদি বহুবিধ কারণে এই সমাজের মানুষগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা, হিংসা-জিঘাংসার কোনো অন্ত নাই। যাজক-পুরোহিত, নারী যেখানে আক্রান্ত হচ্ছেন, সেখানে নানাবিধ কারণে যাদের শত্রু আছে, তাদের ঘুম হারাম হয়ে যাওয়ার কথা। সুতরাং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া শুধু স্বাভাবিকই নয়, জরুরিও ছিল। কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে শত্রুকে চিহ্নিত করা জরুরি। একেবারে নিছক সন্দেহের বশে যদি একদিনে তিন হাজারের বেশি মানুষকে আটক করা হয় এবং তা এক সপ্তাহজুড়ে চলবে বলে আগাম ঘোষণা দিয়ে রাখা হয়, তবে এর পেছনে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন বা গ্রেপ্তারবাণিজ্যের উদ্দেশ্যের অভিযোগ ওঠলে সাধারণ মানুষ তা অবিশ্বাস করবে কিভাবে?

বিগত কয়েক বছর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে যে সহিংসতা চালানো হয়েছে এবং সরকার তা যেভাবে কঠোর হস্তে দমন করেছে তাতে বর্তমানে একটা রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তাতে অনেকেই ধারণা করছেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই গোপন হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটানো হচ্ছে। সরকারের অভিযোগটাও যে এদিকেই তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্যে থেকে স্পষ্ট। পাশাপাশি বিশ্বরাজনীতির বর্তমান টালমাটাল অবস্থায় জঙ্গিবাদ একটি বড় ইস্যু। সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিগুলো বিশ্বময় আধিপত্য বিস্তারের জন্য জঙ্গিবাদ ইস্যুটিকে নিয়ে খেলা করছে বহু বছর ধরে। আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া তার চাক্ষুস প্রমাণ। ভূ-রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এখানেও তাদের লোলুপ দৃষ্টি পড়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এখানে ঘটে যাওয়া একেকটি হত্যাকাণ্ডের পর পশ্চিমা কয়েকটি দেশের অতি-প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন, দফায় দফায় প্রতিনিধি প্রেরণ, বিদেশিদের নিরাপত্তা দানে সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আন্তরিকতা স্বীকার করার পরও নিজেদের বারবার 'নিরাপত্তাহীনতা'র উদ্বেগ প্রকাশ ইত্যাদি নানা কারণে পশ্চিমারা এখানে কোনো গুটি চালছে কি না, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও সংশয়-সন্দেহ রয়েছে। সরকারপ্রধান শেখ হাসিনাও নিকট অতীতে একাধিকবার এ ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেছেন, "তারা (পশ্চিমা কয়েকটি দেশ) চাচ্ছেন আমরা স্বীকার করে নেই আমাদের এখানে আইএস আছে। আর আমরা তা স্বীকার করে নিলেই তারা এখানে উড়ে আসবে। বাংলাদেশকে আরেকটি আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়ায় পরিণত করবে।" তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, কলকাঠি যেই নাড়ুক, যারা এই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটাচ্ছে তাদের পরিচয় যতটা না রাজনৈতিক বা দলীয়, তার চেয়ে বড় পরিচয়, তারা সন্ত্রাসী। আবার সেই সন্ত্রাসটাও আদর্শিক সন্ত্রাস। এরা নিছক সম্পদ লুট বা ক্ষমতায় যাওয়ার লোভে হত্যাকাণ্ড চালায় না। এখানে তাদেরকে ব্যবহার করা হয় অত্যন্ত সুকৌশলে, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে। সুতরাং সবার আগে যেটা প্রয়োজন তা হলো, সমস্যাটি অভ্যন্তরীণ রাজনীতি থেকে উৎপন্ন, নাকি বিশ্ব-রাজনীতির অংশ, নাকি ধর্মীয় আদর্শ থেকে উদ্ভূত সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে যাওয়া। তার উপরই নির্ভর করছে, এর বিরুদ্ধে অ্যাকশনটা কেমন হবে, পুলিশি বা সামরিক, নাকি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, নাকি ধর্মীয়, নাকি রাজনৈতিক। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেভাবে এদিকে-ওদিকে টার্গেট করে 'ফায়ারিং' শুরু করেছে বলে মনে হচ্ছে, তা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কতটুকু কাজে আসবে তা নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে।

# সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিরা কী চায়?

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

সাম্রাজ্যবাদীরা চায় যুদ্ধ। তারা চায় যুদ্ধ হোক যাতে করে তাদের অস্ত্র ব্যবসা জমজমাট হয়, নতুন নতুন যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হয়। যেন প্রচুর বুলেট বিক্রি হয়, বোমা বিক্রি হয়, যুদ্ধ বিমান, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন, মিসাইল, মারণঘাতী রাসায়নিক অস্ত্র বিক্রি হয়। কত মানুষ মরল, কত মানুষ আহত হলো, কত মানুষ বিকলাঙ্গ হলো, কত মানুষ উদ্বাস্তু হলো সেটা তাদের মাথাব্যথা নয়। বোমা কি হাসপাতালে পড়ল, না মসজিদে পড়ল, না মন্দিরে পড়ল এটা তাদের দেখার বিষয় না। কারণ তারা আত্মাহীন, ধর্মহীন, মানবতাহীন একটি অর্থলোলুপ বস্তুবাদী সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। এখানে অর্থ আর ক্ষমতাই শেষ কথা। ধর্ম ও ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকেও তারা সদা-সর্বদা স্বার্থসিদ্ধিতে যেভাবে পারছে ব্যবহার করেছে। তারা আজকে যাকে নায়ক বানিয়েছে আগামীকাল তাকে প্রয়োজনে খলনায়ক বানাতে এক মুহূর্তও দেরি করবে না। আজকে যাকে দেবতা বলে প্রচার চালাচ্ছে কালকে তাকে শয়তান বানাতেও এতটুকু দ্বিধা করবে না। এটা এক প্রতারণানির্ভর সভ্যতা, তাই এর নাম আল্লাহর শেষ রসুল (সা.) দিয়েছেন 'দাজ্জাল' যার অর্থ চাকচিক্যময় প্রতারক। তাদের প্রতারণামূলক প্রচারণার প্রধান হাতিয়ার তাদের শক্তিশালী মিডিয়া (Media)। প্রতিটি দেশে বিপুল পরিমাণে তাদের ভাবাদর্শের মিডিয়া রয়েছে যারা প্রভুর ইচ্ছা পূরণ করার জন্য সদা উদগ্রীব হয়ে থাকে। প্রপাগান্ডা চালিয়ে আগ্রাসনকে জায়েজ করার কূটনীতি আমরা দেখেছি আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, ফিলিস্তিন সর্বত্র। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে তারা সব ছারখার করে দিয়েছে কিন্তু এখনও অধরা 'স্বপ্নের' গণতন্ত্র। এখন গোটা মুসলিম জাতিকে যখন 'সন্ত্রাসী' বানিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে তখন বিশ্বের যে কোনো দেশ দখল করে নেওয়া কেবল প্রক্রিয়াগত বিষয়। প্রশ্ন হচ্ছে তাদের নেক নজর (!) এখন কোন দেশের দিকে পড়েছে?

অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, চলমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে এটা সুস্পষ্ট যে আমাদের এই প্রিয় বাংলা-ভূমির দিকে তাদের শ্যেনদৃষ্টি পড়েছে। তাদের ষড়যন্ত্র দিন দিন দৃশ্যমান হচ্ছে। এদেশে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠছে একদিকে ধর্মবিদ্বেষ প্রচার অপরদিকে ভিন্নমতকে চাপাতি-নিধন, ধর্মানুভূতির প্রলয়নাচন। পাশাপাশি চলছে রাজনীতিকদের বিপজ্জনক 'বন্ধু' সন্ধান ও সন্ত্রাস দমনে প্রভুদের সহযোগিতার প্রস্তাবনা ইত্যাদি। সবাইকে বুঝতে হবে, প্রভুদের অর্থনীতির নাম যুদ্ধ অর্থনীতি, ওয়ার ইকোনমি। সেই অর্থনীতির চাকা ঘোরানো তেল হচ্ছে মানুষের রক্ত। ঔপনিবেশিক যুগ থেকে আমাদের সম্পদ শোষণ করে তারা নিজেদের দেশে সম্পদের প্রাচুর্য সৃষ্টি করেছে, তারা সীমাহীন ভোগবিলাসে, জীবন উপভোগে মত্ত। এখনও তারা ভাইপারের মতো গরীব দেশগুলোর সম্পদ শোষণ করে যাচ্ছে তৃতীয় বিশ্ব তকমা দিয়ে আমাদেরকে 'সম্মানিত দাস' (Dignified Slave) বানিয়ে রেখেছে। তাদের এ কাজে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অভিভাবকত্বের আসনে আসীন আরব বিশ্ব গত এক শতাব্দী ধরে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মুসলিম জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে যাচ্ছে। এই নব্য জাহেলিয়াতে শক্তিই আইন, শোষণই অর্থনীতি। মাত্র ৬২ জন ব্যক্তি বিশ্বের অর্ধেক সম্পত্তির মালিক। আর অধিকাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে ভাত-কাপড়ের জন্য জীবন দিয়ে দিচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ধর্মব্যবসায়ীদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণকারী এই জনগোষ্ঠীর কোনো বিষয়ে সত্যনিষ্ঠা না থাকলেও আছে বিপুল ধর্মীয় অনুভূতি। কানে হাত না দিয়ে চিলের পেছনে দৌড়াতে তারা ভালোবাসে। ধর্ম গেল, ধর্ম গেল বলে কেউ একটা গুজব রটিয়ে দিলেই পুরো জাতি মেতে ওঠে হুজুগে। এটা কোনো জাতীয় চরিত্র হতে পারে না। এই সংখ্যা যত বৃহৎই হোক তা দিয়ে জাতির অগ্রগতি হয় না। মহানবীর (সা.) শিক্ষাও এটা নয়। প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী হুজুগে মাতেননি। তাঁরা সুপরিকল্পিতভাবে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে লক্ষ্য স্থির করে তারপর জানের বাজি রেখেছেন। ফলে তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোমান ও পারসিক সাম্রাজ্যও তাদের সামনে পর্যুদস্ত হয়েছে। সুতরাং এখন প্রয়োজন এই জাতির সঠিক শিক্ষার, প্রয়োজন সঠিক সিস্টেমের। বিভাজনের রাজনীতি, ধর্মের নামে অন্ধত্বের প্রসার বন্ধ করে ন্যায়ের উপর, হকের উপর জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা এখন অস্তিত্ব রক্ষার্থে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক- এমাম, হেযবুত তওহীদ।

১৪ মার্চ ২০১৬। নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে মসজিদ নির্মাণকে গীর্জা নির্মাণ বলে গুজব ছড়িয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় হেযবুত তওহীদ সদস্যদের বাড়ি-ঘর, ভেঙ্গে দেয়া হয় নির্মাণাধীন মসজিদ। এভাবেই হাত-পায়ের রগ কেটে, চোখ উপড়ে, জবাই করে হত্যা করা হয় তাদের দুই সদস্যকে। এমনকি পেট্রল ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় লাশ দু'টি।

## গুজব রটিয়ে স্মরণকালের পৈশাচিক বর্বরতা

# সোনাইমুড়ির জোড়া খুন

নিজাম উদ্দীন

ঘটনাটি গত '১৪ মার্চ ২০১৬' তারিখের। ঘটনাস্থল নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার পোরকরা গ্রাম। ওই দিন সকালে স্থানীয় মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেওয়া হয়- মুসলমান খ্রিস্টান যুদ্ধ শুরু হয়েছে, মুসলিম ভায়েরা এখনই জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। জিহাদী জোশে স্লোগান ওঠে- 'খ্রিষ্টান মারো গীর্জা ভাঙ্গো'। ব্যস, আর যায় কোথায়, আশপাশের গ্রাম থেকে শত শত মানুষ লাঠি, রড, দা, কুড়াল, পাথর, তলোয়ার ইত্যাদি নিয়ে এক যোগে আক্রমণ চালায় হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমামের বাড়িতে। কারণ, ইতোমধ্যেই হেযবুত তওহীদের সদস্যদেরকে খ্রিষ্টান এবং তাদের নির্মাণাধীন মসজিদকে গীর্জা বলে অপপ্রচার চালিয়ে রেখেছিল হামলায় ইন্ধনদাতা ধর্মজীবী গোষ্ঠীটি। গুজবের ভিত্তিতে হামলা চালিয়ে সেদিন হেযবুত তওহীদের দুইজন সদস্যকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে চোখ উপড়ে, রগ কেটে ও জবাই করে হত্যা নিশ্চিত করার পরও আক্রোশ না মেটায় মৃতদেহে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সেইসাথে দুইটি বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

### এই ভয়াবহ ঘটনার নেপথ্য কারণ

ধর্মভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতাকর্মীরা এতে মূল ষড়যন্ত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ব থেকেই হেযবুত তওহীদের এমামের পরিবারের সাথে গ্রামের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কয়েকটি পরিবারের দ্বন্দ্ব ছিল। এর মধ্যে হায়দার আলীর পরিবার ও ইউনুস মাস্টারের পরিবার উল্লেখযোগ্য। তারা দীর্ঘদিন থেকে একটি ইস্যুর সন্ধান করছিল- কীভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায়। ২০০০ সালে যখন হেযবুত তওহীদের বক্তব্য প্রচারিত হতে থাকে যে, ধর্মের নামে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যেকোন স্বার্থ আদায়কে আল্লাহ হারাম করেছেন, তখন জামাত শিবিরের নেতাকর্মীরা এই বক্তব্যের সামনে প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং স্থানীয় কয়েকটি

মসজিদের ইমামদেরও প্ররোচিত করতে থাকে। ঐ ইমামদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক দলের অনুসারী। তারা এই অপপ্রচারে নিজ নিজ দলকেও যুক্ত করে শুরু করল একযোগে অপপ্রচার। তারা সুপরিকল্পিতভাবে মুসল্লিদের মধ্যে গুজব চালু করে দেয় যে হেযবুত তওহীদ খ্রিষ্টান হয়ে গেছে আর সাধারণ কুসংস্কারপ্রবণ অন্ধবিশ্বাসী মানুষ আলেম শ্রেণির এসব কথার আগ-পাছ চিন্তা না করে তাদের লেবাস-সুরত ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশ্বাস করতে থাকে। এমনই একটি সুযোগের অপেক্ষা করছিল গ্রামের ঐ পরিবারগুলো। হায়দার আলীর পরিবার, ইউনুস মাস্টারের পরিবার এবং ভুইঞাবাড়ির মহিউদ্দিন বেছুর পরিবার। তারা এই ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের পায়তারা শুরু করল এবং ইমাম-আলেম শ্রেণিকে অর্থ ও ইন্ধন যোগাতে লেগে গেল। রাস্তাঘাটে, মসজিদে মাদ্রাসায় রটানো হলো- হেযবুত তওহীদ উরুতে সিল দিয়ে খ্রিষ্টান হয়ে গেছে, তারা কালো কাপড় দিয়ে মুর্দা দাফন করে, পূর্ব দিকে ফিরে নামাজ পড়ে ইত্যাদি জঘন্য বানোয়াট মিথ্যা। এভাবে আক্রমণের পটভূমি রচনা সম্পন্ন হলে একদিন শুরু হয় আক্রমণ। রেল লাইন থেকে হাজার হাজার পাথর এনে হামলা চালানো হয়। রাতের অন্ধকারে গগনবিদারি চিৎকারে আশে পাশের মানুষ ভয়ে আতঙ্কে ঘর থেকে বের হওয়ার সাহসও পায় নি। ইউনুছ এর বড় ছেলে বিপ্লবের নেতৃত্বে তখন ঐ হামলা হয়। যা হোক কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির হস্তক্ষেপে সে যাত্রায় বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। তারপর মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়। আদালতে সেই মামলায় হেযবুত তওহীদ নির্দোষ প্রমাণিত হয়।

এভাবে ক্রমাগত অপপ্রচার, হামলা, অবরোধ চলতে থাকে, কয়েকটি পরিবারের উপর চলে নির্মম সামাজিক ও শারীরিক নির্যাতন। প্রত্যেকবারে তারা স্থানীয় থানা পুলিশকে হাত করে ফেলে যেন পুলিশ না আসে। এখানে একটি কথা প্রাসঙ্গিক যে হেযবুত তওহীদের এমামের পিতা নুরুল হক মেম্বার একটানা প্রায় ২০ বছর এলাকার ইউপি সদস্য হিসাবে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ২০০৯ সালে যখন স্থানীয় ইউপি নির্বাচনের তফসীল ঘোষণা করা হয় তখন গুঞ্জন চলছিল জনাব নুরুল হক চেয়ারম্যান প্রার্থী হবেন। ব্যাস আর যায় কোথায়, আবার শুরু হলো অপপ্রচার, আবার মসজিদে মসজিদে কে বা কারা মিথ্যা হ্যান্ডবিল রচনা করে বিলি করতে থাকে। এদিকে রহিম, ইউনুছ মাষ্টার, জহির, মহিউদ্দিন বেছু গংরা ধর্মব্যবসায়ী এক শ্রেণির মোল্লাদের টাকা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে তারা যেন ধর্মপ্রাণ মানুষকে ওয়াজ করে উত্তেজিত করে। শফিক মোল্লা, নুরুল আলম মুন্সী প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই কাজে নিয়োজিত হয়। এদিকে জামায়াত শিবির এই ইস্যুটাকে পুরোপুরি কাজে লাগায়। তারা নির্বাচনে জেতার জন্য শুরু করে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার অর্থাৎ হেযবুত তওহীদকে একটা ইস্যু বানিয়ে ফেলে। শুরু হলো একযোগে অপপ্রচার- হেযবুত তওহীদ খ্রিষ্টান, আমাদের গ্রামে খ্রিষ্টানের জায়গা নেই, খ্রিষ্টান মার, তাহলে তোমাদের জান্নাত নিশ্চিত ইত্যাদি। ২০০৯ সালের ১০ মার্চ সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় হামলা-আক্রমণ। একে একে ৮টি বাড়ি লুট করা হয়, তারপর পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ধর্মব্যবসায়ী একটি শ্রেণি এবং চিহ্নিত কিছু ব্যক্তির নেতৃত্বে পুকুরের মাছ গাছপালা, বৈদ্যুতিক তার, টয়লেটের টিন, পানির কল সব কিছু লুটপাট করে নিয়ে যায়, ক্ষেতের ধান হাস-মুরগী গরু ছাগল সব গনিমতের মাল, খ্রিষ্টানদের সম্পদ - সব জায়েজ ঘোষণা দিয়ে লুট করা হয়। ঘরে অবস্থানরত ২৪জন নারী শিশু বৃদ্ধকে হত্যা করার জন্য বার বার আক্রমণ চালানো হয়। হামলার কয়েক ঘণ্টা পরে আহত রক্তাক্ত এই পরিবারের আক্রান্ত ২৪ জন সদস্যকেই পুলিশ উল্টো নিরাপত্তার নাম করে মিথ্যা মামলা দিয়ে আদালতে চালান করে দেয়। পরে তারা আদালত থেকে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে বের হয়ে আসেন। ইতোমধ্যে ইউপি নির্বাচনে জামাতের স্থানীয় নেতা হানিফ মোল্লা চেয়ারম্যান হয়ে যায় শুধু এই ইস্যুটাকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়ে। সেই থেকে ২০১২ পর্যন্ত তিনটি বছর এই পরিবারটিকে ঘরবাড়ি হারিয়ে এখানে সেখানে অবর্ণনীয় জীবন-যাপন করতে হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে তারা আবার নিজ বসত বাড়িতে ফেরত গেলেও থাকার জায়গা ছিল না। সবই তো ধ্বংসস্তুপ। কয়েকদিন খোলা আকাশের নিচে থাকার পর ধীরে ধীরে নতুন করে ঘর নির্মাণ শুরু হয়। নতুন করে বাঁচার লড়াই শুরু হয়।

নির্মাণাধীন সেই বাড়িতে তারা তখনও উঠেন নি, ইতোমধ্যে আবারো ২০১৬ সালের ইউপি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। শুরু হয় নতুন করে ষড়যন্ত্র। তারা অপপ্রচার চালাতো হেযবুত তওহীদ নামাযই পড়ে না। তখন হেযবুত তওহীদ সিদ্ধান্ত নেয় যে, ধর্মব্যবসায়ী ষড়যন্ত্রকারী মিথ্যুকদের পেছনে নামাজ না পড়ার কারণে যেহেতু অপপ্রচার চালানো হচ্ছে সুতরাং আমরা নিজেরা নিজেদের বাড়িতে একটি মসজিদ নির্মাণ করে নামাজ পড়ব। তাহলে সকলেই ধর্মব্যবসায়ীদের মিথ্যাচার ধরতে পারবে। এই সিদ্ধান্তের পরে হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে মসজিদ নির্মাণের প্রস্তুতিগ্রহণ শুরু হয়। মসজিদ উদ্বোধন করলেন ক'জন আলেম। মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হলো। আশপাশের জেলা থেকে

বেশ কিছু সদস্য এসে স্বেচ্ছায় মসজিদের নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করলেন। এদিকে আবারো কে বা কারা হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে নাম ঠিকানাবিহীন একটি মিথ্যা হ্যান্ডবিল রচনা করে। মোটর সাইকেলে করে পাঞ্জাবী টুপি পরা কয়েকটা যুবক মসজিদে মসজিদে সেটা জুমার দিন দিয়ে যায়, আর কতিপয় মসজিদের ইমাম ঐ হ্যান্ডবিল যাচাই-বাছাই না করেই পড়ে পড়ে মুসল্লীদের উত্তেজিত করতে থাকে। নির্বাচনী ফায়দা হাসিলের জন্য জামাত শিবিরের কর্মীরা শুরু করে অপপ্রচার আর ষড়যন্ত্র। কিন্তু এবার তাদের ষড়যন্ত্র ছিল ভায়াবহ এবং সুদূরপ্রসারী। তারা চাইছিল হেযবুত তওহীদের এমামের পুরো পরিবারসহ সকল সদস্যদের হত্যা করে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে। তাদের মনে এতবড় জিঘাংসা ও ষড়যন্ত্র প্রথমে আঁচ করা যায় নি। প্রত্যেকবারের মতো এবারো হেযবুত তওহীদের সদস্যরা বারবার থানা পুলিশকে জানিয়েছেন কিন্তু থানা রহস্যজনক কারণে কোন পদক্ষেপ নেয় নি, সন্ত্রাসীদের নিবৃত্ত করে নি। আর তারই স্বাভাবিক পরিণতিতে গত ১৪ মার্চ ২০১৬ নৃশংস হামলার শিকার হয় হেযবুত তওহীদের নিরপরাধ সদস্যরা।

ধর্মের নামে সেদিনের ওই ভয়াবহতম পৈশাচিক ঘটনা স্মরণকালে বিরল। বিভিন্ন গণমাধ্যমে আসা ভিডিওচিত্রে পরিষ্কার দেখা গেছে- সাধারণ জনতার আড়ালে হাতে লম্বা ধারালো কিরিচ, চাপাতি, রড ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের প্রশিক্ষিত ক্যাডাররা অংশ নিয়েছে। জনগণকে উস্কে দেওয়া, উন্মাদনা ধরে রাখা, বৃষ্টির মতো হাজার হাজার পাথর নিক্ষেপ করা, আগুন জ্বালিয়ে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, লুটপাট চালানো, রাস্তার গাছ কেটে বেরিকেট সৃষ্টি করা, থানায় আক্রমণ, পুলিশের উপর হামলা ইত্যাদি সকল কাজে নেতৃত্ব দিয়েছে কথিত ওই ধর্মভিত্তিক দলগুলোর ক্যাডাররা। উপরন্তু তাদের ধর্মীয় লেবাসের ভেতরে যে রক্তপিপাসু হায়েনা বাস করে সেটাও উন্মোচিত হয় সেদিন হেযবুত তওহীদের দুইজন সদস্যকে জবাই করে হত্যা করার মাধ্যমে।

## গুজব রটিয়ে হত্যাকাণ্ড: কীসের ইঙ্গিত?

হামলকারীরা চাইছিল হেযবুত তওহীদের একজনকেও জীবিত না রাখতে, কারণ খ্রিষ্টান জীবিত থাকলে তাদের ঈমান থাকবে না, তাদেরকে জাহান্নামী হতে হবে বলে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। ফলে পুলিশ হেযবুত তওহীদের আহত-রক্তাক্ত সদস্যদেরকে উদ্ধার করতে গেলে হামলকারী সন্ত্রাসীরা পুলিশের উপরেও চড়াও হয়। তারা পুলিশের গাড়িতে হামলা করে, রাস্তায় গাছ ফেলে রেখে, ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পুলিশি উদ্ধারে বাধার সৃষ্টি করতে থাকে এবং হেযবুত তওহীদের সদস্যদেরকে ছিনিয়ে নেওয়ার অপচেষ্টা চালায়। এ কারণে মাত্র আট কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পুলিশের সময় লাগে প্রায় ছয় ঘণ্টা। তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে ধর্মোন্মাদ সন্ত্রাসীগুলো থানায় হামলা চালিয়ে বসে। কতখানি উন্মাদনায় বিভোর হলে, কতখানি কথিত জিহাদী জোশে উদ্দীপ্ত হলে তারা পুলিশকে আক্রমণ করে কথিত খ্রিষ্টানদেরকে কেড়ে নিয়ে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। মসজিদের ইমামের কিছু মিথ্যাচার, একটি নাম-ঠিকানাবিহীন হ্যান্ডবিল এবং ধর্মভিত্তিক কয়েকটি দলের নেতৃস্থানীয়দের ফতোয়া- ব্যস, অপপ্রচার এতটাই কার্যকরী হলো যে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রকৃত ইসলামের কথা বলার পরও হেযবুত তওহীদ হয়ে গেল খ্রিষ্টান, আর হেযবুত তওহীদের

এই সেই নির্মাণাধীন মসজিদ এবং মসজিদের মিম্বর। যাকে ওই ধর্মব্যবসায়ীরা 'গীর্জা' বলে অপপ্রচার চালিয়েছিল। জঙ্গি সন্ত্রাসীরা এই তাণ্ডব চালানোর সময় কিছু সাধারণ মানুষ এমনভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে, সওয়াবের আশায় তারাও সন্ত্রাসীদের সহযোগী হয়ে মসজিদটি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়।

মসজিদ যেখানে প্রতিদিন আযান দিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া হচ্ছে সেটা হয়ে গেল গীর্জা। সাধারণ মানুষ জানলই না বুঝলই না এরা খ্রিষ্টান নয়, এরা মু'মিন-মুসলমান, উম্মতে মোহাম্মদী। তাদের বলার কোনো সুযোগই থাকল না যে, এরা নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর সত্যদ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে। কেউ জানতে পারল না হেযবুত তওহীদ কী চায়, কী বলে, আর কেনই বা এই আন্দোলনের প্রতি ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ক্রোধ আছড়ে পড়ে বারবার। অপপ্রচারের চাদরে ঢাকা পড়ল সেসব সত্য।

পরবর্তীতে কিছু মিডিয়া ঘটনাটিকে 'মতাদর্শগত বিরোধ' বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বিষয়টা তা নয়। সেখানে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে গণরোষ সৃষ্টি করতে কী প্রচারণা চালানো হয়েছে সেটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রচারণা চালানো হয়েছে হেযবুত তওহীদ খ্রিষ্টান, সুতরাং গীর্জা ভাঙ্গো, খ্রিষ্টান মারো। অর্থাৎ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কী পরিমাণ ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে বা হচ্ছে তা অনুমান করা কঠিন নয়। হামলাকারী ধর্মান্ধরা কিন্তু মনে করেছে যে তারা খ্রিষ্টানদেরকেই মারছে, খ্রিষ্টানদেরকেই জবাই করছে, খ্রিষ্টানদের উপাসনালয় ভাঙছে এবং এতে তাদের খুব সওয়াব হচ্ছে। তারা যাদেরকে মারছে তারা যে প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টান নয়, মুসলমান- এটা তাদেরকে বুঝতেই দেওয়া হয় নি। ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে স্বার্থরক্ষার এ ঘটনা থেকে কী বার্তা পাওয়া যায় তা বোঝার জন্য সাধারণ জ্ঞানই যথেষ্ট মনে করি।

## বর্তমান পরিস্থিতি

এজাহারভুক্ত কয়েকজন বাদে মূল আসামীদের এখনও পুলিশ গ্রেফতার করছে না। কিলিং মিশনে সরাসরি অংশ নেওয়া শিবির নেতা সাহাদাৎ, রবিউল, মহিউদ্দিন বেছু, জহির, নুরুল আলম মুন্সি, রহিম, করিম গংরা এখনও আছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আবারো গ্রামে কোনো অঘটন ঘটানোর জন্য এরা ষড়যন্ত্র করে বেড়াচ্ছে। এদেরকে দ্রুত আইনের আওতায় নিয়ে এলেই জোড়াখুনের আসল রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়া সম্ভব। আর তা না করতে পারলে এরা বারবার এলাকায় অপপ্রচার চালাতেই থাকবে, ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করতেই থাকবে এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটাতেই থাকবে- এমনটাই আশঙ্কা প্রকাশ করছে গ্রামবাসী।

## কয়েকজন বিদেশে পালিয়েছে

ইতোমধ্যে খবর পাওয়া গেছে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে কাশেম মেম্বারের ভাই হাসেম সৌদি আরব পালিয়েছে এবং জয়নালের ছেলে মাহফুজ ওমান পালিয়েছে। এরা হত্যামামলার সুনির্দিষ্ট আসামী। এদেরকে সিলেটের রাজন হত্যাকারী কামরুলের মতো গ্রেফতার করে বিচারের মুখোমুখী দাঁড়া করানোর জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা।

## এক অশনিসংকেত

প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষের ধর্মবিশ্বাসের অপব্যবহার করে, সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুজব রটিয়ে ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা এবং পূর্বশত্রুতার খায়েশ চরিতার্থ করার যে অপসংস্কৃতি চালু হচ্ছে তা নিয়ে ভাবতে হবে। মনে রাখতে হবে- তারা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল 'খ্রিস্টান মার-গীর্জা ভাঙ্গো'- এই স্লোগান দিয়ে। সংখ্যালঘু জনগণকে টার্গেট করে জনতাকে উত্তেজিত করা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করার এমন দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে দেশ ও জাতির জন্য ভয়াবহ অশনিসংকেত বহন করে।

**হেযবুত তওহীদের এমামের বাড়ি এবং তাঁর চাচার বাড়ি লুটপাট চালানোর পর আগুন ধরিয়ে দেয়, পুড়িয়ে দেয় ১৪টি মোটরসাইকেল। বাজারে তাদের সদস্যদের দোকান লুট করা হয়। ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে দিনে দুপুরে পুলিশের সামনে এমন ধংসযজ্ঞ নজিরবিহীন।**

# ঈমান নামক মহাশক্তির অপব্যবহার রোধ করার উপায়

রুফায়দাহ পন্নী

মানুষের ঈমান এক মহাশক্তিশালী চেতনা যা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, মানুষকে জান্নাতে নিতে পারে। কিন্তু যদি ঈমানদার ব্যক্তির ইসলাম সম্পর্কে আকিদা ভুল হয় তাহলে সেই ঈমানকেই ধ্বংসাত্মক ও ভয়ানক সঙ্কট সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। এজন্যই বোধহয় সমস্ত আলেমগণ একমত ছিলেন যে আকিদা সহীহ না হলে ঈমানের কোনো দাম নেই। এবং স্বভাবতই ঈমানের কোনো দাম না থাকলে ঈমানভিত্তিক আমলও মূল্যহীন হয়ে যায়। আকিদা সঠিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামের বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ে হাজার হাজার বই রচনা করেছেন।

সংক্ষেপে আকিদা হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক সম্যক ধারণা, ইসলামের কোন কাজটি কেন করতে হয়, না করলে কী ক্ষতি হয় এটা বোঝা। এটা বোঝা যে, আল্লাহ কী উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, নবী-রসুল পাঠিয়েছেন, কিতাব দিয়েছেন। কিতাব কি দেখে দেখে পড়ার জন্য, নাকি শুধু মুখস্ত করার জন্য, নাকি প্রতিষ্ঠা করার জন্য? ধর্ম আগমনের উদ্দেশ্য কী, মানবজীবনের সার্থকতা কী, কোন কাজটা সওয়াবের, কোন কাজটা গোনহের, কোনটা মানবতার কল্যাণ করবে কোনটা মানবতার ক্ষতি করবে, কোনটি করলে ব্যক্তির পরিশুদ্ধি আসবে, কোনটি করলে সমাজের পরিশুদ্ধি আসবে ইত্যাদি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণার নাম হলো আকিদা। আল্লাহ, তাঁর মালায়েক, সমস্ত সৃষ্টি, জান্নাত-জাহান্নাম, হাশর, তকদির ইত্যাদি বিষয়গুলোও আকিদার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। এই আকিদা সঠিক হওয়া প্রত্যেক মো'মেনের জন্য অপরিহার্য। তা না হলে একটি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী বার বার মানুষের ঈমানকে ভুল খাতে প্রবাহিত করে তাণ্ডবলীলা বাধিয়ে দিয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধার করবে। দুঃখজনক এই দৃশ্য আমরা মানবজাতির অতীত ইতিহাসেও দেখেছি, বর্তমানেও দেখতে পাচ্ছি।

কিছুদিন পর পর আমাদের দেশে এমনই দাঙ্গাপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে। 'ঈমানের দাবি' পূরণ করার ধুয়ো তুলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সেই পরিস্থিতিতে জড়ানো হয়। এসব পরিস্থিতি সৃষ্টিতে প্রায়ই গুজব ব্যবহার করা হয়, বিকৃত, অর্ধসত্য এমনকি ডাহা মিথ্যা কথাও প্রচার করা হয়। অর্থাৎ যে কোনো প্রকারেই হোক একটি ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করা চাই-ই চাই। এটা কেউ উপলব্ধি করে না, দেশে যেখানে একটি প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা আছে, আইন-আদালত আছে, সেখানে

আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে এভাবে তাণ্ডব সৃষ্টি করে দিলে ধর্মও রক্ষা হয় না, দেশও রক্ষা হয় না, ঈমানও রক্ষা হয় না। সবদিকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। আকীদা বিকৃতির কারণে তাদের মধ্যে এ বোধটুকুও কাজ করছে না।

আর এদিকে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা একটি শ্লোগান চালু করেছেন যে, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। এটা নিয়ে তর্কে যাব না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সকল বস্তুর যেমন ধর্ম রয়েছে, রাষ্ট্রেরও একটি ধর্ম রয়েছে। কিন্তু সেটা প্রচলিত অর্থে কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাস নয়। বস্তুর ধর্ম না থাকলে যেমন বস্তুর স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি রাষ্ট্রও ধর্ম হারালে তার অস্তিত্ব থাকে না। ধর্ম মানে ধারণ করা। রাষ্ট্রের ধর্ম কী? সে কী ধারণ করবে? সেটা হচ্ছে 'ন্যায়'। সে 'ন্যায়দণ্ড' ধারণ করবে। যেটা ন্যায় সেটা দুর্বলতম ব্যক্তি বললেও সেটাকে ন্যায় বলে গ্রহণ করতে হবে। যেটা অন্যায় সেটাকে অন্যায় হিসাবেই প্রতিপন্ন করতে হবে, তা যত বড় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধেই যাক না কেন। এই 'ন্যায়ধর্ম' হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের ভিত্তি। রাষ্ট্র যদি হুজুগ কিংবা একটি গোষ্ঠীর অনুভূতি দ্বারা চালিত হয়ে ন্যায়কে বিসর্জন দেয় তাহলে রাষ্ট্র সময়ের স্রোতে ধসে পড়তে বাধ্য। এটাই রাষ্ট্রের ধর্ম বা রাষ্ট্রধর্ম।

কীভাবে? রাষ্ট্র যখন তার এই 'ন্যায়ধর্ম' ত্যাগ করবে তখন জনগণ রাষ্ট্রের উপর আস্থা হারাবে। তখন আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হবে, ডাকাতকে পুলিশে না দিয়ে নিজেরাই মেরে ফেলবে। আজকের পৃথিবীতে রাষ্ট্রগুলো তাদের ন্যায়ধর্ম হারিয়েছে বলেই সর্বত্র এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের আস্থা অর্জন ছাড়া কোনো রাষ্ট্র টিকতে পারে না। আর জনগণের আস্থা ফিরে পেতে হলে রাষ্ট্রকে তার ন্যায়বিচারের ধর্ম ধারণ করতেই হবে।

প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের সামষ্টিক অসন্তোষ প্রকাশের জন্য একটি মতবাদের ভাষা লাগে, একটি জ্বালামুখ লাগে। সমাজতন্ত্রের আদর্শের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল। সমাজতন্ত্রের পচন ও পতনের পর তাদের একটি অংশ হতাশাগ্রস্ত হয়ে সন্ত্রাসবাদের দিকে চলে যায়। ঠিক একই অবস্থায় বর্তমানে ইসলাম রয়েছে কেন্দ্রবিন্দুতে। মুসলিম বিশ্বে পুঁজিবাদী শোষণ, ইসলামবিদ্বেষী প্রপাগান্ডা ও সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশের অবলম্বন হিসাবে এখন ইসলামকে ধারণ করা হচ্ছে। কিন্তু এখানেও একটি অংশ মতবাদভিত্তিক সন্ত্রাস তথা জঙ্গিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

রাষ্ট্র যদি ন্যায়ের উপর দণ্ডায়মান না হয় তাহলে কোনোভাবেই অসন্তোষের অগ্নুৎপাতকে ফেরাতে পারবে না, কোনো না কোনো ইস্যু দিয়ে সে তার জ্বালামুখ খুঁজে নেবেই। আজ রাষ্ট্রধর্ম তো কাল শিক্ষানীতি, পরশু ধর্ম অবমাননা ইত্যাদি, ইস্যুর কোনো অভাব হবে না। ইস্যুগুলো কেবল একটার পর একটা সৃষ্টি হতেই থাকবে। এই সব ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন ও সহিংসতার মোকাবেলার জন্য রাষ্ট্রকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। এভাবে তো বেশি দিন চলা যাবে না। আর এজন্য শুধু শুধু ধর্মকেও দোষারোপ করে লাভ নেই, রাষ্ট্র ন্যায়দণ্ড ধারণ করুক, জাতি রক্ষা পাবে।

পাশাপাশি বর্তমানে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতার চর্চা হচ্ছে, সহিংসতার নিয়ামক হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কেবল নির্দিষ্ট একটি ধর্ম নয়, যে যেখানে সুযোগ পাচ্ছে, সেখানেই ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। বিশ্বের অন্যান্য স্থানে মোসলমানরা আক্রান্ত হচ্ছে। আমাদের এখানে যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম ইসলাম তাই এখানে ইসলামের নামে অরাজকতা সৃষ্টির পথ রোধ করতে হলে রাষ্ট্রের ন্যায়ের ব্যাপারে আপোসহীন হওয়ার পাশাপাশি ইসলামের প্রকৃত আকিদা সাধারণ জনগণকে অবগত করা খুবই জরুরি। দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, আমাদের সাধারণ জনগণের মধ্যে ইসলাম সম্বন্ধে প্রকৃত আকিদা নেই। ইসলামের নাম বলে একেকজন একেক দিকে তাদের ঈমানকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একেক গোষ্ঠী একেকভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করছে। কেউ মানুষ হত্যা করাকে জেহাদ-কেতাল আখ্যা দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে উদ্বুদ্ধ করছে, কেউ কেউ রাজনীতিক স্বার্থ হাসিলের ক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে জনগণের ধর্মীয় চেতনাকে। যেভাবে হালভাঙা নৌকা মুহুর্মুহু স্রোতের টানে দিক পাল্টায় ঠিক সেভাবে কোর'আন হাদীসের উক্তি ব্যবহার করে যখন জনগণের সামনে কেউ তার প্রচারণা চালায় তখন ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ঈমান বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয়। এভাবে যে যেভাবে খুশি বিভিন্ন চোরাগলিতে তাদেরকে যেন টেনে নিয়ে যেতে না পারে সেজন্য প্রয়োজন ধর্মের প্রকৃত পথটি দেখিয়ে দেওয়া অর্থাৎ তাদের আকিদা ঠিক করে দেয়া। ধর্মের পূর্ণ ও প্রকৃত চিত্রটি তাদের সামনে তুলে ধরা। এটা যতদিন না করা হবে ততদিন মানুষ গুজব শুনে 'ধর্মরক্ষা'র জন্য উন্মাদিত হবে।

আমাদের অনুসরণীয় অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব কে? নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসুল (স.)। আসুন দেখি তিনি কীভাবে মানুষের ঈমানকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করেছেন এবং মানুষের আকিদাকে বিকৃত হতে দেননি। তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ মহামানব ছিলেন যিনি তাঁর জীবনে কোনো কাজই মিথ্যার ভিত্তিতে, গুজবের ভিত্তিতে, মানুষকে ধোঁকা দিয়ে কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেননি। মদীনায় তাঁর ৩ বছরের ছেলে ইব্রাহীম যেদিন ইন্তেকাল করলেন, ঘটনাক্রমে সেদিন সূর্যগ্রহণ হলো। আরবের নিরক্ষর, অনেকটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের মনে এই ধারণা হলো যে, যার ছেলে মারা যাওয়ায় সূর্যগ্রহণ হয়, তিনি তো নিশ্চয়ই আল্লাহর রসুল, না হলে তাঁর ছেলের মৃত্যুতে

কেন সূর্যগ্রহণ হবে? কাজেই চলো, আমরা তাঁর হাতে বায়াত নেই, তাঁকে আল্লাহর রসুল হিসাবে মেনে নেই, তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করি। তাদের এ মনোভাব মুখে মুখে প্রচার হতে থাকল। আল্লাহর রসুল (সা.) যখন একথা শুনতে পেলেন, তিনি নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে লোকেদের ডাকলেন এবং বললেন– "আমি শুনতে পেলাম তোমরা অনেকেই বলছ, আমার ছেলে ইব্রাহীমের ইন্তেকালের জন্য নাকি সূর্যগ্রহণ হয়েছে। এ কথা ঠিক নয়। ইব্রাহীমকে আল্লাহ নিয়ে গিয়েছেন আর সূর্যগ্রহণ একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। এর সাথে ইব্রাহীমের মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই।" (হাদীস, মুগীরা ইবনে শো'বা ও আবু মাসুদ (রা.) থেকে বোখারী)।

এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক খেয়াল করুন। ঐ সময় মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড টানাপোড়েন ও বিতর্ক চলছে যে তিনি আসলেই আল্লাহর রসুল কি রসুল নন। এমতাবস্থায় রসুলাল্লাহ কিছু না বলে যদি শুধু চুপ করে থাকতেন, কিছু নাও বলতেন, দেখা যেত অনেক লোক তাঁর উপর ঈমান এনে ইসলামে দাখিল হতো, তাঁর উম্মাহর সংখ্যা বৃদ্ধি পেত - অর্থাৎ যে কাজের জন্য আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন সেই কাজে তিনি অনেকটা পথ অগ্রসর হয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এসেছিলেন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে, তাই তিনি মিথ্যার সঙ্গে এতটুকুও আপোস করলেন না। সাময়িক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করেন নি। সত্যের উপর দৃঢ় অবস্থান থাকার কারণে তিনি একটি গুজবকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দিলেন না। তিনি শক্তভাবে এর বিরোধিতা করলেন। নিজের স্বার্থে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে ভুল খাতে প্রবাহিত হতে দেননি। তাহলে সেখানে তাঁর উম্মত দাবি করে আমরা কীভাবে হুজুগের সুযোগ গ্রহণ করে ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, রাজনৈতিক অভিসন্ধি হাসিল করতে পারি? গুজবের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে মো'মেনদের আল্লাহ নিষেধ করেছে। আল্লাহ বলেছেন, কেউ যেন কারো উপর অপবাদ আরোপ না করে এবং কোনো দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি কোনো সংবাদ নিয়ে আসলে বিশ্বাস করার আগে যেন তা অবশ্যই যাচাই করে নেয় (সুরা হুজরাত-৬)।

সুতরাং ধর্মকে যদি কল্যাণকর কাজে, জাতির উন্নয়নে ব্যবহার করতে হয় তাহলে ধর্মবিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর ধর্ম সম্পর্কে ধারণা, আকিদা সঠিক করতে হবে এবং পাশাপাশি সরকারকে সর্ব বিষয়ে ন্যায়ের ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হতে হবে, এটাই ইসলামের মূলনীতি, তওহীদের নীতি। অন্যথায় জাতি ভয়ঙ্কর অস্তিত্ব সংকটে পড়ে যাবে এবং সেটা থেকে উত্তরণের সময় থাকবে না একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বিশেষ করে যখন আমাদের সামনে ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের উদাহরণ রয়েছে তখন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেওয়া আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে বলে মনে করি।

# চোখ ডলে নিন

রিয়াদুল হাসান

.

ধর্ম আর ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট এক নয়।
ঈমান আর অন্ধবিশ্বাস এক নয়।
স্রষ্টার আনুগত্য আর উপাসনা এক নয়।
জেহাদ আর জঙ্গিবাদ এক নয়।

.

ভোটাধিকার আর নির্বাচন এক নয়।
দেশপ্রেম আর রাজনীতি এক নয়।
আটক আর নিরাপত্তা এক নয়।
উল্লাস আর উন্মাদনা এক নয়।

.

বাক-স্বাধীনতা আর গালাগালি এক নয়।
বিজ্ঞানমনস্কতা আর ধর্মবিদ্বেষ এক নয়।
আধুনিকতা আর ইংরেজপ্রীতি এক নয়।
চেতনা আর হুজুগ এক নয়।

.

বড় মানুষ আর বড়লোক এক নয়।
ভোগবিলাস আর শান্তি এক নয়।
মানুষ আর হমো স্যাপিয়ান্স এক নয়।
আলেম আর ধর্মব্যবসায়ী এক নয়।

.

সভ্য আর শিক্ষিত এক নয়।
শিক্ষক আর শিক্ষাজীবী এক নয়।
ফ্যাশন আর অশ্লীলতা এক নয়।
সাংবাদিকতা আর তথ্যসন্ত্রাস এক নয়।

.

সেবা আর বাণিজ্য এক নয়।
উন্নয়ন আর ফ্লাইওভার এক নয়।
প্রেম আর মোহ এক নয়।
ভালোবাসা আর কামনা এক নয়।

.

বন্ধুরাষ্ট্র আর প্রভুরাষ্ট্র এক নয়।
শিয়া-সুন্নী আর মুসলিম এক নয়।
খাদ্য আর মল-মূত্র এক নয়।
মানুষ আর লাশ এক নয়।

# দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ কেন ও কীভাবে?

মসীহ উর রহমান

অনেক মানুষই নিজেকে দেশপ্রেমিক বলে প্রচার করেন যাদের দেশপ্রেম নিয়ে মানুষ প্রশ্ন তোলে। যখন দেখা যায় তারা এদেশের খেটে খাওয়া মেহনতি কৃষক, শ্রমিক, কর্মজীবী মানুষের রক্ত পানি করা অর্থ দিয়ে বিদেশে বাড়ি-গাড়ি করেন, ছেলেমেয়েদের বিদেশে পড়াশুনা করান, সুইসব্যাংকে টাকার পাহাড় জমান, দেশের জনগণের টাকা বিদেশে পাচার করেন। তাদের চরিত্র এ উপমহাদেশ ২০০ বছর শোষণকারী ব্রিটিশদের মতো। সেই ইংরেজদের সাথে তাদের যথেষ্ট মিল আছে। উভয়ের চরিত্রের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। ইংরেজরা এদেশ দখল করেছিল। তাদের বাড়ি-গাড়ি, পরিবার-পরিজন, বিষয়-সম্পত্তি ছিল সব ইংল্যান্ডে। তারা এদেশ শাসন করলেও, এদেশে বাস করলেও, এদেশের মানুষের অর্থ-সম্পদ, সেবা ভোগ করলেও তারা এদেশকে কখনই নিজেদের দেশ মনে করত না। কাজেই তাদের এদেশের প্রতি আর এদেশের মানুষের প্রতি কোন মায়া বা দায়বদ্ধতা ছিল না। বন্যা, খরা জলোচ্ছাসে কে না খেয়ে মারা গেল, দাঙ্গা-ফাসাদে কোন এলাকা ধ্বংস হল এগুলো তাদের চিন্তার বিষয় ছিল না। এগুলোতে তাদের কোনো কিছুই আসত-যেত না। তাদের জন্য সর্বদা জাহাজ প্রস্তুত থাকত। কোন সমস্যা বা একটু অসুবিধা হলেই তারা জাহাজে চেপে ইংল্যান্ডে চলে যেত। সাথে নিয়ে যেতো অঢেল অর্থ-সম্পদ। ঠিক এখনও দেশপ্রেমিক নামধারী রাজনৈতিক নেতা, আমলা ও ব্যবসায়ীদের অনেকেরই পাসপোর্ট রেডি থাকে, বিদেশে বাড়ি-গাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স, পুত্র-পরিজন সবই রেডি থাকে। দেশে তাদের কোনো সমস্যা, মামলা, সরকার পরিবর্তন হলে অর্থাৎ তাদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে ধস নামলেই চিকিৎসা বা অন্য কোনো অজুহাতে বিদেশে পাড়ি জমান। এক কথায় বলা যায়, ব্রিটিশরা যেমন এদেশ থেকে অর্থ সম্পদ লুট-পাট করে ইংল্যান্ডে গাড়ি, বাড়ি, জমি-জমা, খামার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করতো তারাও ঠিক সেইরকম। এসমস্ত লোকেরা কখনও দেশপ্রেমিক নয়। দেশপ্রেমিক তো তারা যারা দেশের মানুষের জন্য, দেশের মানুষের মুক্তির জন্য, কল্যাণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে, এবং নিজেদের সমস্ত অর্জন, সমস্ত আয়, সমস্ত পরিশ্রম, সমস্ত কিছু দেশের মাটির জন্য, মানুষের জন্য বিলিয়ে দেয়। এখন এই দেশপ্রেম ও দেশপ্রেমিক একটা দেশের জন্য কতটুকু প্রয়োজন? এ প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে প্রথমেই বলতে হয় দেশের কথা। একজন ব্যক্তি যেমন পরিবারের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পরিবার ছাড়া যেমন ব্যক্তি অস্তিত্বহীন তেমনি একটি পরিবার, সমাজ, সংঘ ইত্যাদিও রাষ্ট্র তথা দেশের উপর নির্ভরশীল স্ব স্ব অস্তিত্বের জন্য। রাষ্ট্র তথা দেশ ছাড়া এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ দেশ যদি না থাকে তাহলে কোন সমাজ, পরিবার কিছুই থাকবে না। আজ থেকে ৪৫ বছর আগে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। পেয়েছি বাংলাদেশ। এখন আমাদের এই বাংলাদেশের সম্মান, মর্যাদা, প্রকৃত সার্বভৌমত্বের জন্য এর ষোল কোটি মানুষের মাঝে দেশপ্রেমের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে। কেন- তা সকলের জানা প্রয়োজন। সবাই যদি এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে তাহলে আর কেউ দেশের জন্য ক্ষতিকর কোনো কর্মকাণ্ডকে মেনে নেবে না এবং স্বার্থচিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে দেশ ও দশের কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে। দেশ থেকে কেবল নেবেই না, দেশকে দেওয়ার মানসিকতাও পোষণ করবে। এটাই প্রকৃত দেশপ্রেম। দেশপ্রেম সম্পর্কে একটি বহুল উচ্চারিত হাদিস রয়েছে "দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ"। কিন্তু বিষয়টি আপেক্ষিক। দেশপ্রেমের মানে এই নয় যে, অন্য দেশের অনাহারী, নিপীড়িত মানুষের প্রতি আমার কোনো দায়িত্ব নেই। মানবতাবোধ সকল ভৌগোলিক সীমারেখার ঊর্ধ্বে। আধিপত্য কায়েম রাখার জন্য অন্য দেশের মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলে নিজেদের দেশের স্বার্থ রক্ষাকে দেশপ্রেম বলে না, এই দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ নয়। মনে রাখতে হবে মানুষের স্থান সবার ঊর্ধ্বে।

দেশপ্রেমিক তো তারা যারা দেশের মানুষের জন্য, দেশের মানুষের মুক্তির জন্য, কল্যাণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে, এবং নিজেদের সমস্ত অর্জন সমস্ত আয়, সমস্ত পরিশ্রম সমস্ত কিছু দেশের মাটির জন্য, মানুষের জন্য বিলিয়ে দেয়।

দেশপ্রেমের প্রকৃত অর্থ হলো দেশ ও দেশের মানুষের সুরক্ষা, ন্যায় নীতি, কল্যাণ, নিরাপত্তা, সুবিচার প্রতিষ্ঠা

করার জন্য আত্মনিয়োগ করা। এর জন্য প্রয়োজন সর্বত্র সত্যের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা করা। রসুলাল্লাহ (সা.) মক্কা নগরীকে খুব ভালোবাসতেন যে বিষয়ে আলেমগণ প্রায়ই ওয়াজ করে থাকেন। তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হেজরত করার সময় কেমনভাবে অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে মক্কাকে বিদায় জানিয়েছিলেন তা মিলাদের মধ্যেও সুর করে গাওয়া হয়। কিন্তু তিনি মদীনাকে রক্ষা করার জন্য যে কঠোর সংগ্রাম করেছেন, পেটে পাথর বেঁধে না খেয়ে থেকেছেন, রক্তক্ষয় ও ত্যাগস্বীকার করেছেন সে কথাগুলো দেশপ্রেমের উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হয় না। কারণ প্রতিষ্ঠিত ধারণা হচ্ছে মাতৃভূমিই হচ্ছে দেশ, তাই যেন দেশপ্রেম থাকতে হবে কেবল মাতৃভূমির জন্য। অথচ মক্কা সত্যকে মেনে নেয়নি, তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছে, নির্মমভাবে নির্যাতন করেছে। পক্ষান্তরে মদীনাবাসী রসুলাল্লাহর (সা.) আহ্বানকে স্বীকার করে সত্যকে মেনে নিয়ে তাঁকে নিজেদের পরিবারভুক্ত করে নিল, সেই মদীনার প্রতি রসুলাল্লাহর প্রেম মক্কা থেকে কোনো অংশে কম ছিল না, বরং বেশিই ছিল কারণ তিনি মক্কা বিজয়ের পর মক্কায় না থেকে মদীনাতেই প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, তাঁর পবিত্র রওজাও সেখানেই। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মানুষের জীবন থেকে অন্যায়, অবিচার, রক্তপাত, হানাহানি নির্মূল করাই ছিল রসুলাল্লাহর জীবনের লক্ষ্য। যারা তাঁর ডাক প্রত্যাখ্যান করেছে তারা যতই রক্তীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হোন, তাঁর প্রকৃত আপনজন তারাই যারা তাঁর আদর্শকে গ্রহণ করে নিয়েছে। সেটা হচ্ছে মদীনা। আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি মক্কার নিজ আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। সুতরাং যে ভূখণ্ডে আল্লাহ আমাকে নিজের ঈমান, বিশ্বাস ধারণ করে নিরাপত্তার সঙ্গে বাস করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন সেটাই আমার ভূখণ্ড। একে রক্ষা করা আমার ঈমানী কর্তব্য। ঐ ভূখণ্ডকে অন্যায়, অবিচার ও মিথ্যার কলুষমুক্ত করার জন্য যে প্রেরণা সেটাই দেশপ্রেম। তাহলে কিভাবে দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ হবে? সেটা হলো, যে দেশে আমার ঈমান (সত্যের প্রতি বিশ্বাস) সংরক্ষিত থাকবে, হেফাযতে থাকবে, যে দেশ হবে সত্যের আধার, মানবতার আধার, যে ভূ-খণ্ড অন্যায়ের সাথে আপস করে না, যে ভূ-খণ্ডে সত্য প্রকাশিত হয়, প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে সবাই সত্য, মানবতা ও শান্তির চর্চা করে, সর্বোপরি আল্লাহর আদেশ নিষেধ মান্য করা হয়, সেই ভূ-খণ্ড, মাটি ও দেশকে রক্ষা করা, সে দেশের জন্য কাজ করা প্রত্যেকের ঈমানী দায়িত্ব। যা আমাদের রসুলাল্লাহ মদীনায় করে গেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের এই বাংলাদেশ কি সত্যের ধারক কিনা, এখানে মানবতা ও শান্তি আছে কিনা? অনেকেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে বলতে পারেন এই দেশে আছে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নোংরা প্রতিযোগিতা, ধর্মের নামে বিভিন্ন কায়দায় স্বার্থ হাসিলের প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এ বিষয়ে আমাদের অর্থাৎ হেযবুত তওহীদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? আমরা মনে করি আমাদের মাননীয় এমামুয্যামানকে আল্লাহ মহাসত্য দান করেছেন এই ভূ-খণ্ডেই, এই বাংলার মাটিতেই। প্রথম দেড়যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে আমাদের দেশের মানুষ কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবীসহ নানান শ্রেণিপেশার মানুষ আমাদের বিরোধিতা করেছেন, আমাদের বিরুদ্ধে ধর্মব্যবসায়ী ও ইসলামবিদ্বেষী মিডিয়াগুলো যুগপৎ সীমাহীন অপপ্রচার চালিয়েছে। যার পরিণামে আমাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে অসহনীয় নির্যাতন। আমাদেরকে অধিকাংশ মানুষ ভুল বুঝেছেন। কিন্তু আল্লাহর অশেষ দয়ায় আজ সেই সকল শ্রেণি পেশার মানুষই যারা আমাদের বিরোধিতা করতো তারাই আজ হেযবুত তওহীদকে, সত্যকে দু'হাত তুলে সমর্থন করছেন। আল্লাহ দয়া করে তাদের হৃদয়কে সত্যের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন, তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। কাজেই বাংলাদেশ এখন আমাদের দৃষ্টিতে সত্যের ভূমি, যেখানে সত্যের আলো তথা ন্যায়-শান্তি-সুবিচার বিকশিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এখান থেকেই আল্লাহর প্রেরিত শাশ্বত মহাসত্যের পুনরুত্থান হয়েছে এবং মানুষ তা সাদরে গ্রহণও করছে ও করবে। ইনশা'আল্লাহ এ সত্য একদিন সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করবে। তাই এই দেশকে নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে, দেশের উন্নতি নিয়ে ভাবতে হবে, দেশে যেন অন্যায়, অনাচার, মিথ্যা টিকতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষ যেন শান্তিতে থাকতে পারে এদেশ যেন কোনো বিপদের মুখে না পড়ে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা এদেশে জন্মেছি, বড় হয়েছি, এদেশের প্রকৃতি আমাদের লালন করেছে, এই মাটিতে আমরা সেজদা করি, আমাদের পূর্ব পুরুষদের অস্তিত্বও এদেশের মাটিতে মিশে আছে। কাজেই এই দেশের জন্য, এখানে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের সবাইকে, ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে সর্বশ্রেণির মানুষকে একত্রে কাজ করতে হবে। দেশি-বিদেশি কোনো শয়তানি শক্তি যেন আমাদের দেশের উপর কালো থাবা বিস্তার করতে না পারে সে দিকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের সামনে লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশের জ্বলন্ত উদাহরণ রয়েছে। সেসব দেশের অধিকাংশ মানুষেরই আজ কোনো বাসস্থান নেই, তারা সব হারিয়ে বিভিন্ন দেশের পথে প্রান্তরে শরণার্থী শিবিরে অবর্ণনীয় দুর্দশায় জীবন কাটাচ্ছে। আমাদের এই এক চিলতে মাটি বুকে আগলে ধরে সমস্ত রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। দেশের ক্ষতি হয়, মানুষের ক্ষতি হয় এমন কাজ যেন কেউ করতে না পারে এজন্য সকলকে সত্য দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যারা দেশপ্রেমিক সেজে, জনসেবার নাম করে দেশের ক্ষতি করে, দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে তাদেরকে প্রথমে আমাদের বুঝাতে হবে, যদি তারা সংশোধিত না হয় তবে তাদেরকে সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এ কাজগুলোই আমাদের ইবাদত ও সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

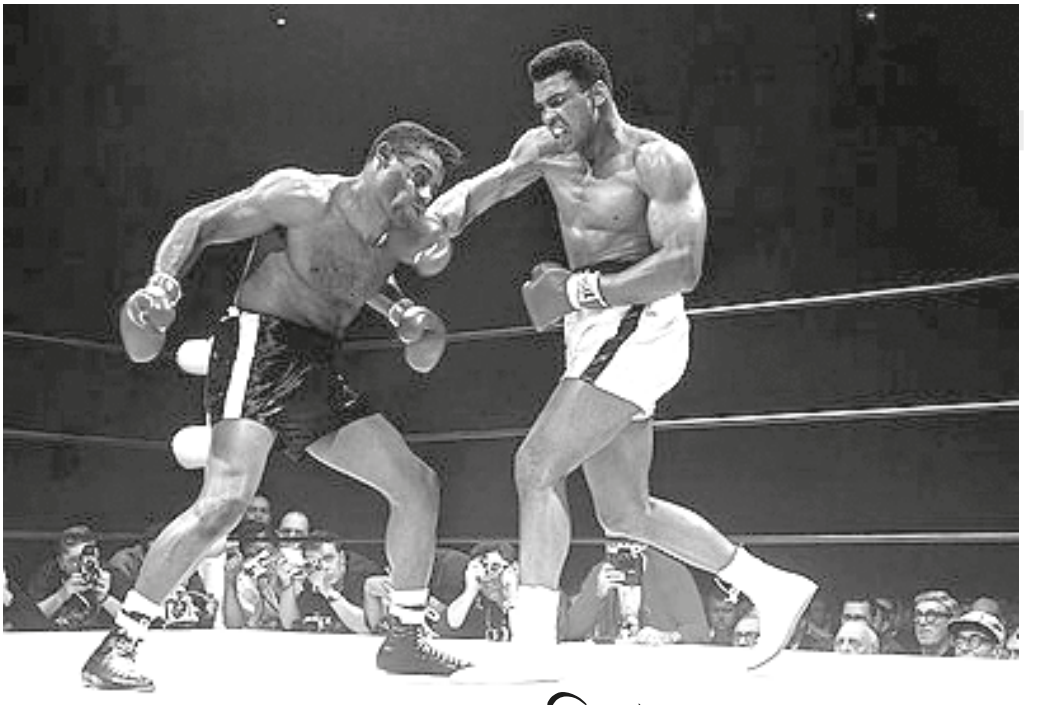

# নক্ষত্রের বিদায়:
# চলে গেলেন মোহাম্মদ আলি

পৃথিবীর ইতিহাসে যে ক'জন ক্রীড়াবিদ তাদের সমসাময়িক কালে মানুষের অন্তরে জায়গা করে নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে 'বক্সিং লিজেন্ড' মোহাম্মদ আলি অন্যতম। ৬১ ম্যাচে ৫৬ জয়। তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। বক্সিংয়ের রিংয়ে তার মতো কেউ আজও আসেননি। কোনোদিন হয়তো আসবেনও না। গত শতাব্দীর সেরা ক্রীড়াবিদ ছিলেন তিনি। কারও কারও মতে তিনি সর্বকালের সেরা বক্সিং খেলোয়াড়। শুধু ক্রীড়াবিদ কেন? মানুষ মোহাম্মদ আলি কি তার চেয়েও কম বড় ছিলেন? কালো মানুষদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তিনি সব সময় ছিলেন সামনের কাতারে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি পান ৫ বছরের সাজা। তবুও অনড় থাকেন 'দ্যা গ্রেট' মোহাম্মদ আলি। গত ৩ জুন পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরপারে চলে যান এই বিশ্বসেরা পেশাদার মুষ্ঠিযোদ্ধা। চলুন জেনে নিই মোহাম্মদ আলির বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

### ১৭ জানুয়ারি, ১৯৪২
### একজন কিংবদন্তির জন্ম

মোহাম্মদ আলির জন্ম ১৯৪২ সালের ১৭ জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকির লুইসভিল শহরে। জন্মের পর মোহাম্মদ আলির নাম রাখা হয় ক্যাসিয়াস মার্সেলাস ক্লে জুনিয়র। তার বাবা সাইন বোর্ড অঙ্কনের কাজ করতেন এবং তার মা একজন খণ্ডকালীন রাধুনী ছিলেন এবং মাঝে মাঝে বিত্তবানদের বাড়িতে ধোয়ামোছার কাজ করতেন। ক্লে এবং তার পরিবার কেন্টাকির একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত অঞ্চলে বসবাস করলেও সে সময়ে কেন্টাকির আইন অনুসারে কালোরা সাদাদের মত শহরের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ পেত না। ফলে সে সময়ে কালোদের অধিকার অর্জনের আন্দোলন নিয়ে আমেরিকার অবস্থা বেশ অস্থিতিশীল ছিল। আর এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ক্যাসিয়াস ক্লে (পরে নাম পরিবর্তন করে মোহাম্মদ আলি রাখেন)-র মাঝে খুব গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল।

মোহাম্মদ আলির শৈশব সম্পর্কে তার মা ওডিসা গ্রেডি ক্লে বলেন, "যখন সে (আলি) ছোট ছিল তখন সে কখনোই এক জায়গায় বসে থাকত না। সব সময় এখানে ওখানে ছুটোছুটি করে বেড়াত। সে সব কিছুই তার বয়সের আগে করে ফেলত।"

### ১৭ জানুয়ারি, ১৯৫৪ (বক্সিংয়ের শুরু)

ক্যাসিয়াস ক্লে (মোহাম্মদ আলি) তখন ১২ বছর বয়সী একজন কিশোর। তার বাবা-মা তার জন্মদিন উপলক্ষে তাকে একটি বাইসাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। কিন্তু একদিন যখন ক্লে একটি স্থানীয় মেলায় ঘুরতে যায় তখন তার সেই বাইসেইকেলটি চুরি হয়ে যায়। প্রিয় সাইকেলটি চুরি হয়ে যাওয়ার পর বেশ রেগে গিয়েছিলেন কিশোর ক্লে এবং তিনি স্থানীয় থানায় গিয়ে পুলিশের একজন অফিসারকে যত দ্রুত সম্ভব তার সাইকেলের চোরকে খুঁজে বের করতে বলেছিলেন। জো মার্টিন নামের সেই পুলিশ অফিসার ছিলেন একজন বক্সিং প্রশিক্ষক। তিনি ক্লেকে বলেন প্রথমে তার শিখে নেওয়া উচিত কিভাবে মারামারি করতে হয় এবং তারপর হুমকি দেওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত সেই পুলিশ অফিসার ক্লে এর প্রথম প্রশিক্ষক হয়ে যান এবং তার প্রশিক্ষণেই ক্লে এ্যামেচার লেভেলে বেশ কিছু বক্সিং টাইটেল জয় করেন।

**৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ (ক্লে'র প্রথম সোনা জয়)**

নিজের ১৮ বছর বয়সে ১৯৬০ সালে প্রথমবারের মতো অলিম্পিকের রিংয়ে নামার সুযোগ পান ক্লে। তার বক্সিং স্টাইল ও ব্যবহার দিয়ে তিনি খুব সহজেই বিশ্ব মিডিয়া এবং তার সহ-এথলেটদের মন জয় করে নেন। বক্সিং রিংয়েও তিনি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর সেবারই তিনি লাইট হেভিওয়েট হিসেবে স্বর্ণ পদক জয় করেন। তিনি এই সোনা জিতে এতটাই গর্বিত ও আবেগাপ্লুত ছিলেন যে, ইতালিতে অবস্থান করার পুরোটা সময়জুড়ে এবং যক্তরাষ্ট্রে অবতরণ করেও তিনি সেই মেডেলটি গলায় পড়ে ছিলেন। তাকে তার নিজের শহর লুইসভিলে সম্মান সূচক গার্ড অব অনার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অলিম্পিকে সোনা জিতলেও তার উপর কেন্টাকির কালোদের উপর বলবৎ আইন লাঘব হয়নি। এর ফলে তিনি শহরে আয়োজিত একটি অল-হোয়াইটস ডিনারে অংশ নিতে পারেননি। পরে মোহাম্মদ আলি মন্তব্য করেছিলেন, "বক্সিং হলো অনেক সাদা মানুষ একসাথে বসে দুইজন কালোর মারামারি উপভোগ করার খেলা।"

**২৯ অক্টোবর, ১৯৬০ (পেশাদার বক্সারে রূপান্তর)**

ইতালির রোমে অলিম্পিকে সোনা জয়ের সাত সপ্তাহ পর ক্লে তার প্রথম পেশাদারি ম্যাচ জেতেন। সেখানে রিংয়ের মধ্যে তিনি তার অসাধারণ এবং অনন্য বক্সিং স্টাইলের পরিপূর্ণ প্রদর্শন করেন। ক্লে'র তার নিজের খেলার স্টাইলের উপর এতটাই ভরসা ছিলো যে মাঝে মাঝে তিনি গার্ড ছাড়াই রিংয়ে নেমে যেতেন এবং পিছনের দিকে ঝুকে গিয়ে প্রতিপক্ষের আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাতেন। এছাড়া তিনি কোন রাউন্ডে গিয়ে ম্যাচ শেষ করবেন সেটা ম্যাচের আগেই ভবিষ্যৎবাণী করে ভক্ত এবং মিডিয়াকে অবাক করে দিতেন। সে সময় ক্লে বেশ কঠিন কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছিলেন যার মধ্যে ইংলিশ বক্সার হ্যানরি কুপারও ছিলেন। তিনি ক্লে-কে মাত্র একটি লেফট হুকের মাধ্যমে নক আউট করে দিয়েছিলেন। তবে ক্লে রিংয়ে তার শক্ত অবস্থান প্রথম থেকেই ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

**৬ মার্চ, ১৯৬৪ ('মোহাম্মদ আলি'র জন্ম)**

কালোদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের নেতা এবং নেশন অব ইসলামের সদস্য মেলকম এক্সের সাথে ক্যারিয়ারের এক পর্যায়ে ক্লে'র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ কারণে সে সময় তার ধর্মান্তর নিয়ে জোর গুজব চলছিল আমেরিকাজুড়ে। এরপর একটি ম্যাচে লিসটনকে হারিয়ে ক্লে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন যে তিনি ধর্মীয় আন্দোলনের একজন স্বক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করেছেন। মার্চ মাসে ক্লে'র আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা এলিঝা মোহাম্মদ তাকে মোহাম্মদ আলি নামটি প্রদান করেন। ক্লে তার দেওয়া সেই নাম এবং তাদের নীতি গ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তার জনপ্রিয়তায় তা এতটুকুও প্রভাব ফেলেনি। আমেরিকান কালো মানুষেরা মোহাম্মদ আলিকে সব সময়ই একজন আপোষহীন নেতা মনে করেছেন যিনি সব সময় তাদের পাশে ছিলেন। নিজের নাম পরিবর্তন সম্পর্কে আলি বলেছিলেন, "ক্যাসিয়াস ক্লে একটি দাসত্বের নাম। আমি আমার নাম হিসেবে এটি পছন্দ করিনি এবং আমি এটি চাইও না। আমি এখন থেকে মোহাম্মদ আলি।"

**২৮ এপ্রিল, ১৯৬৭ (আলি এবং আমেরিকান সরকারের দ্বন্দ্ব)**

তখন আমেরিকার সাথে ভিয়েতনামের যুদ্ধ চলছে। মোহাম্মদ আলি একদিন আমেরিকান আর্মিতে যোগদানের আদেশ পান। এরপর মোহাম্মদ আলি বক্সিং রিংয়ের পরিবর্তে কোর্ট রুমে সরকারের সাথে আইনী লড়াইয়ে নামেন। আলি আমেরিকার সরকারের প্রতি অভিযোগ আনেন যে, তার ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে তাকে যুদ্ধে যোগ দিতে চাপ দিচ্ছে সরকার। তিনি আরো অভিযোগ করেন অন্য একটি ধর্মীয় গ্রুপের উপর অত্যাচার ও অবিচার করার একটি প্রস্তাবে রাজি না হওয়ার কারণে সরকার তাকে যুদ্ধে প্রেরণ করতে চাইছে। আদালত মোহাম্মদ আলির চ্যাম্পিয়নশিপের পদক কেড়ে নেয় এবং তাকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি ১০ হাজার ডলার জরিমানা করে। তিন বছর পর মোহাম্মদ আলির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়। এরপর আলি আমেরিকাজুড়ে বিভিন্ন কলেজে ভ্রমণ করেন এবং তখনকার বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে তাদের সাথে কথা বলেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ হিসেবে দেয়া নিজের একটি পাবলিক স্টেটমেন্টে আলি বলেন, "যারা তাদের নিজেদের অধিকার ও স্বাধীনতা আদায়ের জন্য লড়াই করছে তাদেরকে দাসে পরিণত করার একটি মাধ্যম হয়ে আমি আমার ধর্ম, আমার মানুষ এবং আমার নিজের মর্যাদাহানি করতে পারবো না।"

**৮ মার্চ, ১৯৭১ (শতাব্দীর সেরা লড়াই)**

১৯৭০ সালে মোহাম্মদ আলি বক্সিং রিংয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরে এসেই তিনি জেরি কোয়েরি এবং অসকার বোনাভেনাকে নক আউট করে দেন। আর তার পরেই তার সামনে ছিলেন হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন জো ফ্রেইজার। ফ্রেইজার এবং আলির মধ্যেকার সেই লড়াইটি শুধুমাত্র বক্সিং রিংয়ের লড়াইকে ছাড়িয়ে দুই ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বসী দুই ফাইটারের মধ্যে আদর্শের লড়াইয়েও পরিণত হয়ে যায়। লড়াইয়ের আগে আলি ফ্রেইজারকে 'আঙ্কেল ট' বলে ডাকেন। মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে আলি এবং ফ্রেইজারের মধ্যেকার সেই লড়াই আমেরিকা এবং সাড়া বিশ্বে অগণিত দর্শক উপভোগ করেছিলেন। সেই লড়াইয়ে মোহাম্মদ আলি ফ্রেইজারের কাছে হেরে যান। এটি ছিল আলির প্রথম পেশাদার ম্যাচের হার।

৩০ অক্টোবর, ১৯৭৪ (শিরোপা পুনরুদ্ধার)

তিনি ১৯৭৪ সালের অক্টোবারে জর্জ ফোরম্যান এর সাথে লড়াই এ নামেন যা রাম্বেল ইন দ্যা জাংগল বলে পরিচিত। আলির ঘোর সমর্থকরাও এতে আলির সম্ভাবনা দেখেননি। ফোরম্যান ও নর্টন আলির সাথে প্রবলভাবে লড়াই করেন ও জর্জ তাদের ২ রাউন্ডে পরাজিত করেন। ফোরম্যান ৪০ টির মধ্যে ৩৭ টি লড়াই নকআউটে জিতেন ৩ রাউন্ডের মধ্যে। আলি এ ব্যাপারটিকে কাজে লাগাতে চাইলেন। সবাই ভেবেছিল তিনি ক্ষিপ্রতার সাথে লড়াই করবেন, কিন্তু তিনি দূরে দূরে থাকতে লাগলেন। ফোরম্যানকে তিনি আক্রমণ করতে আমন্ত্রণ করলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল তাকে ক্লান্ত করে দেওয়া। ৮ম রাউন্ডে তিনি তার সুযোগ পেয়ে গেলেন ও ফোরম্যানকে নকআউট করেন। প্রায় ৮০ হাজার দর্শকের সামনে আলি তার নতুন একটি কৌশলের মাধ্যমে জর্জ ফোরম্যানকে হারিয়ে আবারো শিরোপা পুনরদ্ধার করেন। সেই লড়াইয়ের শেষে ফোরম্যান আলি সম্পর্কে বলেন, "আমি তাকে সর্বকালের সর্বসেরা হিংস্র বক্সার বলবো না কিন্তু সে আমার দেখা সবচেয়ে ভালো মানুষ।"

**১০ ডিসেম্বর, ১৯৭৪ ( হোয়াইট হাউজে আমন্ত্রণ)**

ফোরম্যানের সাথে জয়ের ফলে আলি আবারো এই গ্রহের সবচেয়ে পরিচিত তারকায় পরিণত হন। তার ভক্তদের তালিকায় এ্যালভিস, নেলসন ম্যান্ডেলার মত বড় বড় নাম ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং জাতিগত বিদ্বেষের ফলে ঘটে যাওয়া ভুল বোঝাবোঝির অবসান ঘটাতে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড আলিকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানান। ১৯৭৫ সালে আলি নেশন অব ইসলামের দীক্ষা ছেড়ে গতানুগতিক ইসলাম ধর্মে ফিরে আসেন। এরপরে আলি ঘোষণা দেন, "মানুষের গায়ের রং ঠিক করে দেয় না যে মানুষটি কেমন হবে, মানুষের হৃদয়, আত্মা এবং চিন্তা-চেতনা ঠিক করে সে কেমন হবে।"

**১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ (ঢাকায় মোহাম্মদ আলি)**

আজ থেকে ৩৮ বছর আগের কথা। ক্যাসিয়াস ক্লে থেকে ইসলাম গ্রহণ করে মোহাম্মদ আলি তখন সারা বিশ্বেই এক আলোচিত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব। শুধু বক্সিং রিং নয়, নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবেও উচ্চারিত হচ্ছিল তার নাম। সেই সময়ে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন মোহাম্মদ আলি। বক্সিং রিং এবং রিং এর বাইরে তিনি তখন দারুণ জনপ্রিয়। নিজের সোনালি সেই সময়টাতেই আলি পা রেখেছিলেন বাংলাদেশের মাটিতে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশ তখন পার করে ফেলেছে ৭টি বছর। ১৯৭৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি, ঢাকার পল্টন ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে উপস্থিত হন মোহাম্মদ আলি। হাজার হাজার জনতা সেদিন এক নজরে এই জীবন্ত কিংবদন্তীকে দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস টাইমস নামে একটি পত্রিকায় তিন বছর আগে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় ঢাকা মোহাম্মদ আলির সফর নিয়ে। ওই রিপোর্টে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের বরাত দিয়ে লেখা হয়, মোহাম্মদ আলিকে দেখার জন্য প্রায় ২ মিলিয়ন মানুষ অর্থাৎ ২০ লাখ মানুষ সেদিন উপস্থিত হয়েছিল ঢাকায়। তখন পল্টন ময়দান সংলগ্ন একটি বক্সিং স্টেডিয়াম স্থাপন করা হয়। যেটার উদ্বোধন করেন মোহাম্মদ আলি এবং ওই স্টেডিয়ামের নামকরণই করা হয় 'মোহাম্মদ আলি স্টেডিয়াম'। ঢাকায় বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে মোহাম্মদ আলি সেদিন তুলে ধরেছিলেন বাংলাদেশের পতাকা। যেন সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন, বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে ধীরে ধীরে।

নব নির্মিত মোহাম্মদ আলি স্টেডিয়ামের রিংয়ে একটি প্রীতি লড়াইয়েও অংশ নেন তিনি। তার বিপক্ষে বক্সিং লড়াইয়ে অংশ নেয় ১২ বছর বয়সী এক বালক। যেন গালিভার আর লিলিপুটের লড়াই। শুধু তাই নয়, মজা করে ওই ১২ বছর বয়সী বালকের হাতে নকআউট হয়ে যাওয়ার অভিনয় করেন তিনি। সফরকালে তার হাতে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে পাসপোর্টও প্রদান করা হয় মোহাম্মদ আলিকে। ওই সময় এই কিংবদন্তী মন্তব্য করেছিলেন, "আমি যদি আমেরিকা থেকে কখনও বিতাড়িত হই, তাহলে কোনো চিন্তা নেই, আরেকটি দেশ পেয়ে গেলাম।"

**২৭ জুলাই, ২০১২ (অলিম্পিকের পতাকাধারী)**

রোম অলিম্পিকে প্রথমবারের মতো অলিম্পিক রিংয়ে নামার প্রায় ৫০ বছরেরও বেশি সময় পরে আবারো বিশ্বের সবচেয়ে বড় আসরে ফিরে আসেন মোহাম্মদ আলি। ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে আলিকে সম্মান সূচক পতাকা বাহকের উপাধী দেওয়া হয়। কিন্তু নিজের শারীরিক অবস্থার কারণে তিনি পতাকা বহন করতে না পরলেও তার স্ত্রীর সাহায্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কিছুটা সময় তিনি মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

**৩ জুন, ২০১৬ (শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ)**

১৯৮০ সালে তিনি পারকিনসন্স রোগে আক্রান্ত হন। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হতো তিনি তার রোগের জন্য বক্সিংকে দায়ী করেন কিনা, তিনি বলতেন- বক্সিং না করলে এত বিখ্যাত হতেন না। অবসরের পরে তিনি তার জীবনকে মানবতার কল্যাণে উৎসর্গ করেছিলেন। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। ৩২ বছর পারকিনসন্স রোগে ভোগার পর গত ৩ জুন, ২০১৬ তারিখে ৭৪ বছর বয়সে মারা যান তিনি।

# ডোনাল্ড ট্রাম্প
# বিতর্কিত মন্তব্যই যার বড় অস্ত্র

মুস্তাফিজ রহমান

ডোনাল্ড ট্রাম্প নামের পাশে সবচেয়ে বেশি যে শব্দটি এখন পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে 'বিতর্কিত'। বাস্তবে তিনি কতটা বিতর্কিত, যারা বিশ্ব রাজনীতির দিকে কম-বেশি নজর রাখেন, তাদেরকে বলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তবে নিজের বিতর্কিত মন্তব্য ও অঙ্গ-ভঙ্গিকেই সম্ভবত তিনি বেছে নিয়েছেন রাজনৈতিক জীবনে সফল হওয়ার প্রাথমিক চাবিকাঠি হিসেবে। নয়তো একজন ব্যক্তি যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হিসেবে লড়তে চান, তিনি কেন নিজেকে এতটা বিতর্কের দিকে ঠেলে দেবেন? তার এই সহজাত স্বভাবের জন্য এখন পর্যন্ত সম্ভবত সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছেন নিজ দল রিপাবলিকান পার্টির অন্যান্য প্রভাবশালী নেতাদের দ্বারা। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই সমালোচনাকে কতটা গায়ে মেখেছেন তিনিই ভালো বলতে পারবেন। কেননা, শত সমালোচনা সত্যেও আশ্চর্যজনকভাবে রিপাবলিকানদের পক্ষ থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়াইয়ের টিকিট তিনি এরই মধ্যে নিশ্চিত করে ফেলেছেন। ডেমোক্রেট শিবিরের প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের মতো বিদগ্ধ রাজনীতিবিদকেও যেখানে নিজ দল হতে মনোনয়ন পেতে হিমশিম খেতে হয়েছে, সেখানে ডোনাল্ট ট্রাম্প, যার রাজনীতিতে অভিজ্ঞতার ঝুলি বলতে গেলে শুন্য, তিনিই নিজ দল থেকে মনোনয়ন পেয়ে গেছেন অনেকটা হেসে-খেলে।

## কে এই ট্রাম্প?

১৪ জুন ১৯৪৬ তারিখে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স এলাকায় জন্ম নেওয়া ট্রাম্পের বাবা ছিলেন একজন রিয়াল এস্টেট ব্যবসায়ী। পিতার ব্যবসার সূত্র ধরে নিজেও এই জগতে প্রবেশ করেন এবং সফলও হন। পড়াশোনাও ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির উপর। তবে ব্যবসায়ীর পাশাপাশি রয়েছে আরো বিচিত্র সব পরিচয়। রেসলিং ম্যাচ উপস্থাপক, টিভি রিয়েলিটি শো'র উপস্থাপক, মিস ইউনিভার্সের স্পন্সর, শেয়ার মার্কেটে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগসহ বহু জায়গায় প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে সর্বত্র সফল হয়েছেন বলা যায় না। বারবার নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছেন, আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন, মামলা ঠুকেছেন, মামলা খেয়েছেন। এভাবে বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে প্রায় ৭০ বছর বয়সে আজ অন্তত ৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদের মালিক ট্রাম্প। তবে এই সাফল্যের সবটাই যেমন নিষ্কন্টক নয়, তেমনি সবটা সততার মধ্য দিয়েও অর্জিত নয়। তার বিরুদ্ধে যেসব মামলা রয়েছে, তার অনেকগুলোই প্রতারণা ও আর্থিক কেলেঙ্কারির মামলা। তবে ট্রাম্পের সহজ স্বীকারোক্তি, তিনি যা করেছেন আইনের ফাঁক গলে করেছেন, আইন লঙ্ঘন করে নয়! আমেরিকায় আরো অনেকেই তা করেন!!

## রাজনীতিতে বিতর্কিত, ধিকৃত; তবে এখন পর্যন্ত সফল

ট্রাম্প যে সুরে কথা বলে আসছেন, যেসব বিতর্কিত প্রস্তাব তুলেছেন, এবং তার জন্য তিনি যে পরিমাণ সমালোচিত ও ধিকৃত হয়েছেন, অনেকেই প্রত্যাশা করেছিলেন যে শীঘ্রই নির্বাচনী প্রচারণা গুটিয়ে নিজের ব্যবসায় ফিরে যাবেন তিনি। কিন্তু হয়েছে তার উল্টা। সবাইকে হতবাক করে দিয়ে তিনিই সবার আগে প্রেসিডেন্ট পদের লড়াই করার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন আদায় করে ফেলেছেন। বিষয়টি অনেকের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হলেও ধূর্ত ট্রাম্প এমন সব বক্তব্যই ব্যবহার করেছেন যা অভিবাসনবিরোধী, সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী মনোভাবাপন্ন বিরাট সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ মার্কিনীর সমর্থন পেতে তাকে পুরোপুরি সহায়তা করেছে। ভারতের বিগত কেন্দ্রীয় নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর বিজেপি সাম্প্রদায়িক ইস্যুকে যেভাবে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের কৌশলও অনেকটা তাই বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। আর বিজেপি যেমন সর্বত্র সমালোচিত হওয়ার পরও সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ নাগরিকদের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করে মসনদে এসেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পও শেষ

পর্যন্ত একই কৌশল অবলম্বন করে ক্ষমতায় যেতে পারবেন কি না, তাই এখন দেখার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আবার রাজনীতির কৌশল হিসেবে মাঝপথেই তিনি সুর নরম করতে পারেন এবং দায়িত্বশীল বক্তব্য দিতে শুরু করতে পারেন, এমনটাও আশা করছেন অনেকে।

## ট্রাম্পের কিছু বিতর্কিত বক্তব্য

**অভিবাসনবিরোধী বক্তব্যঃ**

ট্রাম্পের মতে, বর্তমানে আমেরিকার অনেকটাই দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণ অভিবাসীরা, বিশেষ করে মেক্সিকো থেকে আগতরা। প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থিতা ঘোষণার প্রথম দিনেই এই মন্তব্য করে তিনি ঘোষণা দেন, প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রথম দিনেই তিনি আমেরিকায় মেক্সিকানদের প্রবেশ বন্ধে কাজ শুরু করবেন। তার মতে মেক্সিকো থেকে ভালো মানুষেরা তার দেশে আসে না, যারা আসে তারা সবাই খারাপ।

**মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্যঃ**

এক টিভি শো'তে ট্রাম্প আমেরিকায় মুসলিমদের প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার পক্ষে মত দেন। তিনি আরো বলেন, জন্মসূত্রে আমেরিকার নাগরিক হওয়ার বিধানটি তুলে দিতে হবে। এর ফলে কোনো মুসলিম ইমিগ্রান্ট বা মুসলিম ট্যুরিস্টের আমেরিকায় জন্ম হওয়া সন্তান আর আমেরিকান নাগরিকত্ব পাবেন না।

**মনোনয়ন না দিলে দাঙ্গাঃ**

মনোনয়নের দৌড়ে অন্য সবার থেকে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও নিজ দলেই তার ব্যাপক সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় এক পর্যায়ে ট্রাম্প বলে বসেন, তাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত না করলে যুক্তরাষ্ট্রে দাঙ্গা বেধে যাবে। সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "দলের বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধির সমর্থন নিশ্চিতের পরও যদি তাকে মনোনয়ন দেওয়া না হয়, তবে দাঙ্গা বাধবে। .....আমার পেছনে এখন লাখো মানুষ রয়েছে।"

গত বছরের জুন থেকে এখন পর্যন্ত এভাবে একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করে মাঠ গরম রেখেছেন ট্রাম্প। মুসলিমদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়া, মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল তোলার পাশাপাশি চীন-ভারত থেকে কর্মসংস্থান ছিনিয়ে নেওয়া, একদিনে আইএসের শিকড় উপড়ে ফেলা, ৯/১১ হামলায় সৌদি আরবের যুক্ত থাকার দাবি করা- এ রকম আরো অনেক বিষয় নিয়ে বিতর্ক তৈরি করেছেন ট্রাম্প।

## কারো কাছে আস্থার নাম, কারো কাছে আতঙ্ক

বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প আসলে হাসি-ঠাট্টার বিষয় নয়। দেশটির একশ্রেণির মানুষের কাছে ট্রাম্পের কথার যথেষ্ট আবেদন আছে। শ্বেতাঙ্গ মার্কিনীরা আমেরিকার জনসংখ্যাগত পরিবর্তনে ভীত। অভিবাসনের কারণে আমেরিকার জনসংখ্যার কাঠামোগত পরিবর্তন এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আগামী ৩০ বছরের মধ্যে এ দেশের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের অধিক হবে অশ্বেতাঙ্গ। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির চলতি হার অব্যাহত থাকলে ২০৪৪ সাল নাগাদ এ দেশের অশ্বেতাঙ্গরা হবে ৫৬ দশমিক ৪ শতাংশ। যারা এমন আমেরিকাকে ভয় পাচ্ছেন, যারা মনে করছেন আমেরিকা কালোদের হয়ে যাচ্ছে, তাদের কাছে ট্রাম্প এক অবতারের নাম। কিন্তু বাকিদের কাছে তিনি এক মূর্তমান আতঙ্কের।

## প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন নিশ্চিত

রিপাবলিকান দল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ডেলিগেট নিশ্চিত করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মনোনয়নের জন্য ট্রাম্পের ১২৩৭ ডেলিগেটের প্রয়োজন ছিল। এপি-র হিসাবমতে মে মাসের শেষ দিকে যখন আরো বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে প্রাথমিক ভোটাভুটি বাকি থাকতেই এই সংখ্যা অতিক্রম করে ফেলেন ট্রাম্প। ফলে এটা এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে পড়ে যে, রিপাবলিকান পার্টির পক্ষ থেকে এই জুলাইয়ে প্রেসিডেন্ট পদে তাকেই মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে। রিপাবলিকান দল থেকে এবার প্রার্থী হওয়ার জন্য লড়াই করে ১৬ জন মনোনয়নপ্রত্যাশী। ট্রাম্পের দোর্দণ্ড প্রতাপের মুখে ১৫ জনই প্রার্থিতার লড়াই থেকে বসে যান।

## জনপ্রিয়তা বাড়ছে ট্রাম্পের

আমেরিকানদের কাছে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। কখনো রাজনৈতিক কোনো পদে না থেকেও ইতিহাস সৃষ্টি করে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হচ্ছেন ট্রাম্প। তার প্রচারিত পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ও বহির্বিশ্বে হাসিঠাট্টা হয়ে থাকে। কিন্তু কিছুতেই পিছপা হচ্ছেন না তিনি। তা ছাড়া দেশের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাকে। নিউ মেক্সিকোতে নির্বাচনী প্রচারে গেলে তার সমাবেশকে ঘিরে সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এর আগেও এমন ঘটনা হয়েছে। তবে ট্রাম্প তার অবস্থানে অনড়। যদিও প্রেসিডেন্ট হলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের ঢুকতে দেবেন না বলে ঘোষণা দেন, তা থেকে কিছুটা সরে এসেছেন। সাম্প্রতিক কিছু জরিপে দেখা যাচ্ছে, ডেমোক্রেটিক পার্টির সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের চেয়ে জনপ্রিয়তায় এগিয়ে গেছেন ট্রাম্প। ৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পের ভাগ্যে কী হয়, তা সময়ই বলে দেবে।

## জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় সবাইকে ‘সাহায্য’ করতে উদগ্রীব যুক্তরাষ্ট্র!

# কিন্তু তাদেরকে সাহায্য করবে কে?

উম্মুততিজান মাখদুমা পন্নী

যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলাটি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। হামলাটি আমাদের দেশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। তা হচ্ছে, যে পরাশক্তিটি নিজেরাই জঙ্গিবাদের মোকাবেলা করতে পারছে না তারা যখন অন্য দেশকে জঙ্গিবাদ মোকাবেলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে চায়, তখন তাদের প্রকৃত অভিসন্ধি যাচাই করার প্রয়োজন। অতীতে তারা যে সব দেশেই সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালিয়েছে সে সব দেশই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, লাখে লাখে মানুষ মারা গেছে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় ৫০ জন সমকামী নিহত আর ৫৫ জন আহত হওয়ার পর আবারও প্রমাণিত হলো যে তাদের দেশও নিরাপদ নয়। এ সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, গণতন্ত্রের ব্যর্থতা আর যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বর্বর প্রচেষ্টাই জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটিয়েছে। তারা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জঙ্গিগোষ্ঠীকে অর্থ-অস্ত্র-প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছে। এখন সেই বিষাক্ত মতবাদ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে মানবতাবিনাশী সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। যুক্তরাষ্ট্রও সেই সন্ত্রাসবাদ দ্বারা আক্রান্ত। সেখানেও বন্দুকধারীদের দ্বারা হত্যাকাণ্ড, গুপ্তহত্যা প্রায় নিয়মিত একটি বিষয়। তাই যুক্তরাষ্ট্রকে মানায় না অন্য দেশে গিয়ে সেখানে সন্ত্রাসদমনের জন্য উপদেশ খয়রাত করা।

প্রকৃত সত্য হচ্ছে, সারা পৃথিবীই সন্ত্রাসবাদ দ্বারা আক্রান্ত। এই সন্ত্রাস থেকে কেবল পুলিশী নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিয়ে কেউ রক্ষা পাবে না। কারণ এটা ধর্মীয় বিশ্বাস বা ঈমান থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে ঈমানকে ভুল পথে চালিত করার ফল। তাই এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে ঈমানকে সঠিক পথে চালিত করা। পুলিশ কি সেটা করতে সক্ষম? না। তারা হলেন ব্যাটন মাস্টার।

এ সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, গণতন্ত্রের ব্যর্থতা আর যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বর্বর প্রচেষ্টাই জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটিয়েছে। তারা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জঙ্গিগোষ্ঠীকে অর্থ-অস্ত্র-প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছে। এখন সেই বিষাক্ত মতবাদ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে মানবতাবিনাশী সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। যুক্তরাষ্ট্রও সেই সন্ত্রাসবাদ দ্বারা আক্রান্ত।

এমনকি সরকারের অর্থপুষ্ট ধর্মব্যবসায়ী আলেম ওলামারাও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর আদর্শিক লড়াই চালাতে সক্ষম নন। কারণ তারা নিজেরাই অর্থের জন্য ধর্মপালন ও ধর্মপ্রচার করেন। পক্ষান্তরে জঙ্গিরা মুসলিম উম্মাহর দুর্দশা ঘোচাতে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নিঃস্বার্থ আত্মবলিদানকারী। যদিও তাদের পথ ভুল তবু ঈমানের চেতনায় তারা পোষ্য আলেমদের বহুগুণ উর্ধ্বে।

এখন আমাদের দেশটিকে জঙ্গিবাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হলে পুলিশি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি দরকার এমন একদল মৃত্যুভয়হীন প্রগতিশীল সংগ্রামী ব্যক্তি যারা -

১. বিকৃত ইসলাম নয়, ধর্মহীনতাও নয় বরং ধর্মের প্রকৃত ও শাশ্বত সত্যের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হবে।

২. যারা নির্বিরোধী ধার্মিক নয় আবার হুজুগে মাতালও নয় বরং সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাণপণ প্রতিবাদী হবে।

৩. যারা ধর্মব্যবসায়ী হবে না বরং দেশ ও মানবতার কল্যাণে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদকে উৎসর্গ করতে উদগ্রীব হবে।

৪. যারা প্রকৃত ইসলামের সুমহান আদর্শকে মানুষের সামনে তুলে ধরে ধর্মের নামে চলা সব অধর্মকে, ধর্মব্যবসা, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ধর্মের নামে স্বার্থের রাজনীতির মুখোশ খুলে দেবে।

৫. যারা কখনো আইন ভঙ্গ করবে না, আইন নিজের হাতে তুলে নেবে না।

বাংলা মায়ের নব প্রজন্মের সন্তানদের উপর আজকে বখে যাওয়ার অপবাদ। এই কালিমা ঘোঁচাতে পারে এমন কি কেউ নেই? আমরা বিশ্বাস করি আছে। এখন দরকার তাদেরকে জাগিয়ে তোলা। সেই কাজটিই করে যাচ্ছে হেযবুত তওহীদ।

রিয়াদুল হাসান

# সনাতনধর্মীদের অস্তিত্ব রক্ষায় মোদির হস্তক্ষেপ কামনা কতটুকু যৌক্তিক?

পিযুষ বন্দোপাধ্যায়

রানা দাসগুপ্ত

ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশি সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিরাপত্তার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। বার্তা সংস্থা পিটিআই'র বরাত দিয়ে খবরটি ছেপেছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অনলাইন ও হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকা। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ইউনিট কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ও মানবাধিকার কর্মী রানা দাসগুপ্ত পিটিআইকে বলেছেন, "মৌলবাদী ও জামায়াতিরা বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের মূলোৎপাটনের চেষ্টা করছে। আমরা মনে করি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ট দেশ হিসেবে ভারত এক্ষেত্রে কিছু করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে আমাদের বড় আশা রয়েছে। তার উচিত এ বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের কাছে তুলে ধরে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।" পরবর্তীতে রানা দাসগুপ্ত পিটিআই প্রচারিত সংবাদে তার বক্তব্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে বলে দাবি করেন। তবে পিটিআই তার এই অভিযোগ নাকচ করে দেয়।

যখন একটি সমাজ থেকে ন্যায়বিচার হারিয়ে যায়, অপরাধীর মধ্যে বর্ণাশ্রম প্রথা মান্য করা হয়, অপরাধী ও প্রশাসন মাসতুতো ভাইয়ের মতো সন্ধিবদ্ধ হয়, তখন সেখানে নির্যাতিত, অধিকারবঞ্চিত মানুষ হাহাকার করতে থাকে। ভারতভাগের সময় থেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরকে আমাদের দেশে অবাঞ্ছিত করে রাখা হয়েছে। বলা হয় তাদের এক পা নাকি ইন্ডিয়ায় থাকে। কথায় কথায় তাদেরকে বলা হয়, 'ইন্ডিয়ায় চলে যাও।' নিজের পূর্বপুরুষের ভিটা ছেড়ে তারা কোথায় যাবে? যিনি বলছেন ভারতে চলে যেতে তিনি কি ভারত থেকে আগত কোনো মুসলিম পরিবারকে ভাই বলে আশ্রয় দিবেন? জীবনেও দিবেন না, তার প্রমাণ সিরিয়ার উদ্বাস্তু মুসলমানেরা যারা আরবের দেশগুলোতে আশ্রয় না পেয়ে ইউরোপের দেশগুলোতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বেশ্যাবৃত্তি ও ভিক্ষাবৃত্তি করছেন।

প্রতিবছর সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা এদেশে হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু তাদের একটি বড় ভরসা হচ্ছে তিনদিকে ঘেরা বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ সনাতনধর্মীদের দেশ ভারত ও তার প্রধানমন্ত্রী যিনি স্বয়ং হিন্দুত্ববাদী। আমি হিন্দু ধর্মকে কটাক্ষ করছি না, কেবল বলতে চাচ্ছি হিন্দুত্ববাদ আর ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ আসলে একই বিষয়। আদতে সনাতন আর ইসলাম একই ধর্ম, যার অনুসারীরা উভয় ধর্মের মূল শিক্ষা থেকে সরে গেছেন বহু শতাব্দী আগেই। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার এখন সব ধর্মের অতি ধার্মিকদের একটি প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতে মুসলিমদের যেভাবে কোনে ঠাসা হয় এখানে হিন্দুদেরকে কোনে ঠাসা হয়। দু' জায়গাতেই সংখ্যালঘু দলনে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়। এটা অস্বীকার করার জো নেই, ধর্মভিত্তিক ও সেক্যুলার রাজনৈতিক দলগুলো সুযোগ পেলেই রাজনৈতিক স্বার্থহাসিলে ধর্মীয় বিভিন্ন ইস্যুকে উসকে দিয়ে ধর্মকে ট্রাম্পকার্ড হিসাবে ব্যবহার করে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রার্থীরা পর্যন্ত ধর্ম ও ধর্মবিদ্বেষকে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য ব্যবহার করেন।

বাংলাদেশে সনাতনধর্মীরা দীর্ঘকাল ধরে নির্যাতিত, তাদের বাড়িঘর দখল করে নেওয়া, তাদের মা-মেয়েকে ধর্ষণ করা, মন্দির ভেঙে ফেলা সব সময়ই চলছে। হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রে তথ্য অতিরঞ্জিত করা হয় কিন্তু যারা বলেন পুরোটাই অসত্য তারা সত্যের অপলাপ করেন। ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আমাদের দেশে ভয়াবহ বাস্তব সমস্যা। এদেশকে অসাম্প্রদায়িক বলা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়। কোনো কোনো এলাকায় এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে অনেকটা সাপে নেউলে

অবস্থা। মালু ডাক এই দেশের হিন্দুদের যে পরিমাণ শুনতে হয়, অনেকে তার নিজের নামও ততবার শোনে না। অনেক এলাকার নামই আছে মালুপাড়া। গত মার্চে সোনাইমুড়িতে হেযবুত তওহীদের সদস্যদেরকে মসজিদের মাইকে লোক ডেকে হত্যার আহ্বান করেছে ইসলামের পুরোহিত আলেমগণ। তাদের মিথ্যা ফতোয়ার উস্কানিতে ইসলামিক উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে বর্বরভাবে হামলা চালিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে হাজার হাজার জনতার মাঝখানে পুলিশের সামনে হেযবুত তওহীদের দুইজন সদস্যকে জবাই করে, চোখ তুলে, হাত পায়ের রগ কেটে, পেট্রল ঢেলে তাদের লাশ আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এরপর তারা উল্লাস করতে থাকে যে, খ্রিষ্টান মেরেছি। আসলে কিন্তু সেখানে গির্জাও ছিল না, খ্রিষ্টানও ছিল না। কিন্তু আহ্বান করা হয়েছিল খ্রিষ্টান হত্যার জন্য, গির্জা ভাঙার জন্য। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক উস্কানি। জনগণও সেই সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে উত্তেজিত হয়েছে। কিন্তু জবাই করেছে দুই জন মুসলিমকে আর ভেঙেছে গির্জা নয় মসজিদ।

... এরপর তারা উল্লাস করতে থাকে যে, খ্রিষ্টান মেরেছি। আসলে কিন্তু সেখানে গির্জাও ছিল না, খ্রিষ্টানও ছিল না। কিন্তু আহ্বান করা হয়েছিল খ্রিষ্টান হত্যার জন্য, গির্জা ভাঙার জন্য। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক উস্কানি। জনগণও সেই সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে উত্তেজিত হয়েছে। কিন্তু জবাই করেছে দুই জন মুসলিমকে আর ভেঙেছে গির্জা নয় মসজিদ।

কী পৈশাচিকতা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এদেশের ধর্মব্যবসায়ীদের মনে লালিত হচ্ছে সেটা বুঝতে শত শত ঘটনার প্রয়োজন হয় না, এই একটি ঘটনাতেই প্রকাশ পায়। চাপাতি দিয়ে গুপ্তহত্যা তো চলছেই কয়েক বছর ধরে। এত হত্যাকাণ্ডের পরও, ভিন্ন ধর্মের এত পুরোহিত মারার পরও, এত মানববন্ধন করার পরও যদি সরকার কার্যকরি কোনো পদক্ষেপ না নিতে পারে, উল্টো যদি রমজান মাসে পুলিশ বাহিনী গ্রেফতার বাণিজ্য শুরু করে দেয় তখন পিযুষ-রানারা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, সরকারের উপর প্রতিবেশী বৃহৎ রাষ্ট্রের চাপ প্রয়োগ কামনা করলে সেটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এর দ্বারা নিজের দেশকে কতটুকু ছোট করা হয় সেটা গভীরভাবে চিন্তা করেছেন কিনা সন্দেহ।

আমাদের দেশে যেই যখন সরকারে গেছে বা বিরোধীদলে গেছে সেই অভ্যন্তরীণ সংকট সমাধানের জন্য আঞ্চলিক ও পশ্চিমা পরাশক্তিদের কাছে ধর্না দিয়েছেন বহুবার। রানাদাশ গুপ্ত ও পিযুষ বন্দোপধ্যায় হয়তো তাদের দেখেও শিখে নিয়েছেন এই কূটনৈতিক কলাকৌশল।

কিন্তু না। বিষয়টা অত সোজা নয়। সবাইকে মনে রাখতে হবে, নিজ দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য তৃতীয় বৃহৎ শক্তিকে ডেকে আনলে তার পরিণতি হয় মীরজাফরের মতো। নিজের গদিও থাকে না, দেশও থাকে না। পিযুষ বন্দোপাধ্যায় ও রানা দাসগুপ্ত যদি ভারতীয় নাগরিক হয়ে এই দেশে অভিবাসী হয়ে থাকতেন, তাহলে এটি হয়তো ন্যায্য হতো। কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে, বাংলাদেশের সম্মানজনক জায়গায় বসে এই কাজটি করা তাদের মোটেও উচিত হয়নি। আমি বলব, তাদের এই কাজটি রীতিমতো আত্মঘাতী। আমি বিশ্বাস করি না, কোনো দেশপ্রেমিক বাঙালি এই কাজ করতে পারেন।

দেশে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তার সমাধান করতে সরকারের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে অনেকেই। কেননা সরকার উগ্রপন্থী আলেমদের সমীহ করে, তাদের দাবি পূরণ করে, সুযোগ সুবিধা দিয়ে শান্ত রাখার নীতি অনুসরণ করেছে। ফলে আদর্শিকভাবে তারা সংশোধিত হননি, জনগণও প্রকৃত ইসলামের পরিচয় পায়নি। এখন সরকার চেষ্টা করছে শক্তি দিয়ে জঙ্গিদের নির্মূল করতে। তাদের কাছে এটাই যথাযথ পদক্ষেপ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা যত বেশি প্রয়োগ করা হবে, ততই বিদ্বেষ আর উগ্রতা বাড়তে থাকবে। পরিসংখ্যান বলে শুধু শক্তি প্রয়োগের পথে গেলে জঙ্গিদের চোরাগোপ্তা হামলা, আত্মঘাতী হামলা বাড়তেই থাকে, পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে ক্ষয়ক্ষতিও। সম্প্রতি ফ্লোরিডায় সমকামীদের একটি ক্লাবে এক মার্কিন যুবক একা পঞ্চাশজন সমকামীকে হত্যা করেছেন, পঞ্চান্নজনকে আহত করেছেন। তারপর পুলিশের গুলিতে নিজেও নিহত হয়েছেন। আইএস দাবি করেছে ওই যুবক তাদের সদস্য। এই আইএসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে বড় বড় পরাশক্তিগুলো। সুতরাং মতবাদগত সন্ত্রাসকে যত দমন করা হয় তত তা আগ্রাসী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। বাংলাদেশ সরকার কি দেখে শিখবে না ঠেকে শিখবে সেটা নীতিনির্ধারকদের এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সাথে সাথে আমি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, আলেম-পুরোহিত, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী-সহ সকল মানুষকে সাম্প্রদায়িক-সেক্যুলার সর্বপ্রকার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার অনুরোধ করছি।

পবিত্র কোর'আন ও রসুলাল্লাহ (স.) -এর নির্দেশনা মোতাবেক

# জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব এবং জাতির বর্তমান অবস্থা

কোর'আনের বাণী:

তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না (সুরা আল-ইমরান-১০৩)।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে আর নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না। বিবাদ করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গেই রয়েছেন। (সুরা আনফাল- ৪৬)।

রসুলাল্লাহ (স.)-এর বিদায় হজের ভাষণ:

মহান আল্লাহর তস্‌বীহ ও পবিত্রতা ঘোষণা করার পর;

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের আনুগত্য কর এবং পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাক। তা না হলে, তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাবে।

হে মানুষ! নিঃসন্দেহে সকল মো'মেন পরস্পর ভাই ভাই এবং সকল মো'মেন এক ব্যক্তি সদৃশ। আমি তোমাদের নসিহত করছি, প্রত্যেক মো'মেন পরস্পর ভাই, তাই কেউ যেন কারও প্রতি যুলুম (অন্যায় আচরণ) না করে এবং কোন একজনকে যেন একাকী বন্ধুহীন বা সাহায্যহীন ছেড়ে না দেয়া হয়। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন। যে ব্যক্তি মো'মেনের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি অন্যের ত্রুটি গোপন করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার ত্রুটিও গোপন রাখবেন।

হে মানুষ! যথাসম্ভব ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন করো। পরস্পর ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাক। তোমাদের রব তোমাদেরকে নিঃস্বার্থ কর্মের হুকুম দিচ্ছেন এবং ফেত্‌না-ফাসাদ ও খুনোখুনী নিষিদ্ধ করেছেন। **যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমরা মো'মেন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর নিজের জন্য তোমরা যা পছন্দ করো, অপর ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ না করা পর্যন্ত তোমরা মো'মেন হতে পারবে না।**

এবং হে মো'মেনগণ! অবশ্যই মহাপবিত্র আল্লাহ তোমাদের ওপর করুণা করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে হিংসা-বিদ্বেষের অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন। এ নেয়ামতের সম্মান করা তোমাদের কর্তব্য এবং তোমরা পরস্পরের সুখে দুঃখে অংশগ্রহণ করো। এক মো'মেন অন্য মো'মেনের জন্য বুনিয়াদ স্বরূপ। যেরূপ দেয়ালের এক ইট অপর ইটকে সংযুক্ত রাখে, সেরূপ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য আমি তোমাদেরকে হেদায়াত করছি। তোমরা যে অবস্থাতেই থাক না কেন, একে অপরের সাহায্য করবে। আমি তোমাদের হুঁশিয়ার করছি যে, তোমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাক, একে অপরকে সাহায্য করো অর্থাৎ আশ্রয় দান কর, তাহলে তোমরা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত থাকবে। অন্যথায় তোমরা স্তূপীকৃত ইটের ন্যায় হবে, কোনো দৃঢ়তা থাকবে না এবং যে কেউ তা উড়িয়ে দিতে পারবে। **মো'মেন তো সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মো'মেন নিরাপদ থাকে।**

মো'মেনের প্রত্যেক জিনিস অপর মো'মেনের জন্য হারাম। পরস্পরের রক্ত, ইজ্জত, আব্রু, সম্পদ এর কোনোটারই ক্ষতি সাধন তোমরা করো না। মানুষের চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে এমন দু'টি গুণ রয়েছে যার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। এর প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান, আর দ্বিতীয়টি মো'মেনদের উপকার সাধন। দোষাবলীর মধ্যেও এমন দু'টি দোষ রয়েছে, যার চেয়ে নিকৃষ্টতম আর কিছুই নেই। প্রথমটি, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, দ্বিতীয়টি কোনো মো'মেনের ক্ষতি সাধন করা। কোনো অবস্থাতেই মো'মেন ভাই এর ওপর যুলুম করা অন্য মো'মেনের জন্য বৈধ নয়। বিপদকালে মো'মেন ভাইকে সাধ্যমত সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য।

বিদায় হজ্বে রসুলাল্লাহ (স.) এর ভাষণে ঐক্যের শিক্ষা:

জেনে রেখো! নিশ্চয়ই মুসলিমরা পরস্পর ভাই ভাই। নিশ্চয়ই মুসলিমগণ এক অখণ্ড ভ্রাতৃসমাজ। কোনো মুসলিমের মাল তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে গ্রহণ হালাল নয়। তোমরা নিজেদের উপর যুলুম করো না।

হে জনগণ! আল্লাহকে ভয় কর। কোনো নাককাটা কাফ্রি গোলাম তোমাদের আমীর নিযুক্ত হলে, এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহর কেতাব অনুসারে পরিচালিত করলে তার কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে।

হে জনগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু এক, তোমাদের পিতা (আদম) এক। তোমাদের প্রত্যেকেই আদমের সন্তান, আর আদমের সৃষ্টি মাটি হতে। সাবধান! অনারবের উপর আরবের কিংবা আরবের উপর অনারবের, কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কিংবা শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। যাহার মধ্যে তাকওয়া আছে সে-ই শ্রেষ্ঠ।

হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, এগুলি দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরলে (অনুসরণ করলে) তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তাহলো 'আল্লাহর কেতাব' ও 'আমার সুন্নাহ' (জীবনাদর্শ)।

ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ উদ্দেশ্যে অন্য কোনো মুসলিমকে ধাক্কা দেওয়া কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। মুসলিম ঐ ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত হতে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ; মো'মেন ঐ ব্যক্তি, প্রাণ ও সম্পত্তির নিরাপত্তার ব্যাপারে যার উপর মানুষ আস্থা রাখতে পারে; মোহাজের ঐ ব্যক্তি, যে পাপ পরিত্যাগ করে এবং মোজাহেদ ঐ ব্যক্তি, যে নফসের (কুপ্রবৃত্তি) বিরুদ্ধে জেহাদে লিপ্ত হয়।

পাঠক, লক্ষ করুন- আখেরী নবী, বিশ্বনবী রহমাতাল্লিল আলামিন, মানবজাতির মুকুটমণি মোহাম্মদ মোস্তফা (স.) তাঁর অতি কষ্টে গড়া জাতিকে লক্ষ করে বার বার আদেশ, উপদেশ, সাবধানবাণী দিচ্ছেন, এই জাতি যেন সর্বদা ঐক্যবদ্ধ থাকে, নিজেরা নিজেরা হানাহানি না করে। অথচ আজ মহানবীর এই কথা কতটুকু ধারণ করে আছে? তারা শিয়া, সুন্নী, হানাফি, শাফেয়ী, হাম্বলী, কাদেরিয়া, নকশবন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া, গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী, রাজতন্ত্রী, আবার পারসিয়ান, আফ্রিকান, ভারতীয়, পাকিস্তানি, আফগানি ইত্যাদি পরিচয়ে শত-সহস্র ভাগে বিভক্ত হয়ে নিজেরা নিজেরা হানাহানি, রক্তারক্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ করে যাচ্ছে। পরিণামে অন্যান্য জাতিগুলোর লাথি, অপমান, লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে, সর্বত্র নিগৃহীত হচ্ছে। কাজেই আমাদেরকে ভাবতে হবে যে, আমরা কি প্রকৃত মো'মেন-মুসলিম আছি? মহানবীর চোখে আমরা কি উম্মতে মোহাম্মদী আছি? এখন আমরা যদি শেষ নবীর প্রকৃত উম্মত হতে চাই, মো'মেন হতে চাই তবে অতি অবশ্যই তওহীদের উপর সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে, আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করতে হবে।

# বিশ্বনবী (সা.) রেগে লাল হয়ে যেতেন কেন?

## রাকীব আল হাসান

জাতির ঐক্য এতটাই প্রয়োজনীয় (Vital) বিষয় যে একটি জাতি, একটি সংগঠন যত শক্তিশালীই হোক, যত প্রচণ্ড শক্তিশালী অস্ত্র-শস্ত্র, ধন-সম্পদের অধিকারীই হোক, যদি তাদের মধ্যে ঐক্য না থাকে তবে তারা কখনই জয়ী হতে পারবে না। অতি দুর্বল শত্রুর কাছেও তারা পরাজিত হবে। তাই আল্লাহ কোর'আনে বহুবার এই ঐক্য অটুট রাখার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। এই ঐক্য যাতে না ভাঙ্গে সে জন্য তাঁর রসুল (সা.) সদা শঙ্কিত ও জাগ্রত থেকেছেন এবং এমন কোনো কাজ যখন কাউকে করতে দেখেছেন, যাতে ঐক্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে তখন রেগে গেছেন। একদিন দুপুরে আব্দাল্লাহ বিন আমর (রা.) রসুলাল্লাহর গৃহে যেয়ে দেখেন তাঁর মুখ মোবারক ক্রোধে লাল হয়ে আছে। কারণ তিনি দু'জন আসহাবকে কোর'আনের একটি আয়াত নিয়ে মতবিরোধ করতে দেখতে পেয়েছিলেন। রসুল (সা.) বললেন- কোর'আনের আয়াতের অর্থ নিয়ে যে কোনো রকম মতভেদ কুফর। নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ তাদের কিতাবগুলির (আয়াতের) অর্থ নিয়ে মতবিরোধের জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে। তারপর তিনি আরও বললেন- (কোর'আনের) যে অংশ (পরিষ্কার) বোঝা যায় এবং ঐকমত্য আছে তা বল, যেগুলো বোঝা মুশকিল সেগুলোর অর্থ আল্লাহর কাছে ছেড়ে দাও (মতবিরোধ করো না) (হাদীস-আব্দাল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে- মুসলিম, মেশকাত)। বিশ্বনবী (সা.) রেগে লাল হয়েছিলেন কেন? এর কারণ তিনি নিজেই পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন- আয়াতের অর্থ নিয়ে মতবিরোধ হয়ে জাতির ঐক্য নষ্ট ও পরিণামে যে জন্য জাতির সৃষ্টি সেই সংগ্রামে শত্রুর কাছে পরাজয় ও পৃথিবীতে এই দীনকে প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা। অথচ ইতিহাস এই যে, যে কাজকে রসুলাল্লাহ (সা.) কুফর বলে আখ্যায়িত করেছেন সেই কাজকে মহা সওয়াবের কাজ মনে করে করা হয়েছে এবং হচ্ছে অতি উৎসাহের সাথে এবং ফলে বিভিন্ন মযহাব ও ফেরকা সৃষ্টি হয়ে জাতির ঐক্য নষ্ট হয়ে গেছে এবং জাতি শত্রুর কাছে শুধু পরাজিতই হয়নি তাদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে।

বিদায় হজ্বে বিশ্বনবীর (সা.) ভাষণ মনোযোগ দিয়ে পড়লে যে বিষয়টা সবচেয়ে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে সেটা তাঁর জাতির ঐক্য সম্বন্ধে তাঁর ভয় ও চিন্তা। স্বভাবতই কারণ জীবনের সবকিছু কোরবান করে অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করে সারা জীবনের সাধনায় একটি জাতি সৃষ্টি করলে এবং সেই জাতির উপর নিজের আরব্ধ কাজের ভার ছেড়ে পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার সময় একটা মানুষের মনে ঐ ভয়, ঐ শঙ্কাই সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াবে। কারণ ঐক্য ভেঙ্গে গেলেই সব শেষ, জাতি আর তার আরব্ধ কাজ করতে পারবে না, শত্রুর কাছে পরাজিত হবে। তাই তাকে বিদায় হজ্বের ভাষণে বলতে শুনি- হে মানুষ সকল! আজকের এই দিন (১০ই জিলহজ্ব), এই মাস (জিলহজ্ব) এই স্থান (মক্কা ও আরাফাত) যেমন পবিত্র, তোমাদের একের জন্য অন্যের প্রাণ, সম্পদ ও ইজ্জত তেমনি পবিত্র। শুধু তাই নয় এই দিন, এই মাস ও এই স্থানের পবিত্রতা একত্র করলে যতখানি পবিত্রতা হয়, তোমাদের একের জন্য

অন্যের জান-মাল-ইজ্জত ততখানি পবিত্র (হারাম)। খবরদার! খবরদার! আমার (ওফাতের) পর তোমরা একে অন্যকে হত্যা করে কুফরী করো না।

আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন এবং আল্লাহর রসুলও বিদায় হজ্বের ভাষণে দীন, জীবনব্যবস্থা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। বাড়াবাড়ি অর্থ হচ্ছে অতি বিশ্লেষণ এবং যতটুকু বলা হয়েছে তার চেয়ে বেশি বেশি করা, আধিক্য (তাশাদ্দুদ) করা। এমন কোনো কাজ দেখলে রসুলাল্লাহ রেগে লাল হয়ে যেতেন এবং যারা তা করত তাদেরকে কঠিনভাবে তিরস্কার করতেন। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ে মসলাহ জানতে চাইলে বিশ্বনবী (সা.) প্রথমে তা বলে দিতেন। কিন্তু কেউ যদি আরও একটু খুঁটিয়ে জানতে চাইত তাহলেই তিনি রেগে যেতেন। একদিন একজন পথে পড়ে থাকা জিনিসপত্র কী করা হবে এ ব্যাপারে রসুলাল্লাহর (সা.) কাছে মসলাহ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তার জবাব দিয়ে দিলেন। ঐ লোকটি যেই জিজ্ঞাসা করলেন যে যদি হারানো উট পাওয়া যায় তবে তার কী মসলাহ? অমনি সেই জিতেন্দ্রীয় মহামানব এমন রেগে গেলেন যে তার পবিত্র মুখ লাল টকটকে হয়ে গেল (হাদীস-যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা.) থেকে বোখারী)। কিন্তু তাঁর অত ক্রোধেও, অত নিষেধেও কোনো কাজ হয়নি। আজকে তাঁর জাতিটিও ঠিক পূর্ববর্তী নবীদের (আ.) জাতিগুলির মতো দীন নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে অতি মুসলিম হয়ে এবং মসলা-মাসায়েলের তর্ক তুলে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। অতঃপর শক্তিহীন হয়ে শত্রুর কাছে পরাজিত ও তাদের গোলামে পরিণত হয়েছে। আরেকটি ঘটনা দেখুন। এক যুবক একদিন রসুলাল্লাহর কাছে এসে বলল "আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই, কিন্তু আমি ব্যভিচার (যেনা) থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারব না"। হাদীস বর্ণনাকারী বর্ণনা করছেন যে সেই মহামানব (সা.) (রাগ তো করলেন নাই বরং) ঐ যুবককে স্নেহভরে নিকটে ডেকে বসিয়ে বললেন তোমার মা, বোন, মেয়ের সাথে কেউ ব্যভিচার করলে তুমি কি তা পছন্দ করবে? সেই যুবক রক্তাক্ত চোখে জবাব দিলো কেউ তা করার আগেই আমি তাকে দু'টুকরো করে কেটে ফেলব।" মহানবী (সা.) বললেন "তাই যদি হয় তবে তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন যে তুমি যার সাথে ব্যভিচার করবে সেও তো কারো মা বা বোন বা মেয়ে।" (হাদীস- বোখারী।)

একবার মহানবীকে (সা.) জানানো হলো যে ওমুক লোক চুরি করে। তিনি রাগও করলেন না, উত্তেজিতও হলেন না, এমনকি ঐ লোকটিকে ধরে আনতেও বললেন না। সহজভাবে জিজ্ঞেস করলেন লোকটি কি নামাজ পড়ে? তাকে জানানো হলো যে, হ্যাঁ, সে নামাজ অবশ্য পড়ে। শুনে মহানবী (সা.) বললেন নামাজই চুরি থেকে একদিন বিরত করবে। (হাদীস)। একদিন আল্লাহর রসুল (সা.) তার আসহাবসহ মসজিদে নববীতে বসা আছেন এমন সময় একজন গ্রাম্য আরব যে নিজেও ওখানে সবার সঙ্গে বসা ছিল উঠে মসজিদের ভেতরেই প্রস্রাব করতে শুরু করল। সাহাবারা সবাই চেচিয়ে উঠলেন- এই থামো থামো (স্বভাবতই)। কিন্তু আল্লাহর রসুল (সা.) তার সাহাবাদের বললেন ওকে বাধা দিও না, করতে দাও। তার আদেশে আসহাব বিরত হলেন এবং লোকটি প্রস্রাব করা শেষ করল। তারপর বিশ্বনবী (সা.) ঐ লোকটিকে কাছে ডেকে বুঝিয়ে বললেন যে এই জায়গা আল্লাহর ইবাদতের জায়গা, আল্লাহকে স্মরণ ও কোর'আন পাঠের জায়গা। কাজেই এখানে কারো প্রস্রাব পায়খানা করা উচিত নয়। তারপর তার আদেশে পানি এনে মসজিদ ধুয়ে ফেলা হলো। (হাদীস- আবু হোরায়রা (রা.) এবং আনাস (রা.) থেকে বোখারী ও মুসলিম)। হাদীসের বর্ণনা এবং ভাষা থেকে একথা পরিষ্কার যে এমন একটা ঘটনায় তিনি বিন্দুমাত্র রাগ করেন নি, একটুও উত্তেজিত হননি। লোকটাকে প্রস্রাব শেষ করতে দিয়েছেন ও তারপর তাকে কাছে ডেকে শান্তভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

পাঠক খেয়াল করুন, আল্লাহর রসুল কী কী বিষয় নিয়ে রাগ করেছেন। উসামা ইবনে যায়েদের অধীনে অভিযানে অংশগ্রহণ না করার কারণে অর্থাৎ জাতির ঐক্য নষ্ট, জাতির লক্ষ্য অর্জন না করা, আমীরের আনুগত্য না করা অর্থাৎ জাতীয় ও সামষ্টিক বিষয়ে তিনি রাগ করেছেন কিন্তু ব্যক্তিগত বিষয়ে তিনি রাগ করেননি। রসুল (সা.) যেসব ব্যাপারে রাগ করেছেন তা আমরা মহাসমারোহে করে যাচ্ছি।

দীনের যে কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক, মতভেদ করাকে তিনি বার বার কুফর বলে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ এতে জাতির ঐক্য বিনষ্ট হয়। জাতির অখণ্ডতা ও অবিভাজ্যতা সম্পর্কে আল্লাহ ও রসুলের এমন স্পষ্ট উদাহরণ ও নীতিমালা সত্ত্বেও বাস্তবে এক মুসলিম জাতি আজ শরিয়াহগতভাবে শিয়া সুন্নি, হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী, আহলে হাদীস ইত্যাদি ভাগে, আধ্যাত্মিকভাবে কাদেরিয়া, নক্‌শবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, আহলে বাইত ইত্যাদি হাজারো ভাগে, ভৌগোলিকভাবে ৫৫টিরও বেশি রাষ্ট্রে বিভক্ত এবং ইহুদি খ্রিষ্টানের নকল করে হাজারো রাজনৈতিক দলে কেউ গণতন্ত্রী, কেউ সমাজতন্ত্রী, কেউ সাম্যবাদী, কেউ রাজতন্ত্রী, কেউ পুঁজিবাদী; গণতন্ত্রীদের মধ্যে কেউ সংসদীয় গণতন্ত্রী, কেউ পুঁজিবাদী গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে কেউ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী, কেউ চীনাপন্থী, মাওবাদী, কেউ মার্কসপন্থী, লেলিনবাদী ইত্যাদি মতাদর্শকে ভিত্তি করে হাজার হাজার দলে বিভক্ত। আল্লাহ বলেন, "সকল মো'মেন ভাই ভাই (সুরা হুজরাত ১০)"। রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদী জাতি যেন একটা শরীর, তার একটা অঙ্গে ব্যথা পেলে সারা শরীরেই ব্যথা অনুভূত হয়' (আব্দাল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)। সেই উম্মতে মোহাম্মাদীর দাবিদার, এক মুসলিম জাতির দাবিদার হাজারো লক্ষ ভাগে বিভক্ত হলো, বিভক্ত হয়ে নিজেরা নিজেরা মারামারি, যুদ্ধ, রক্তপাত, দাঙ্গা ইত্যাদি করল; এতে জাতির যে সংজ্ঞা রসুল দিলেন অর্থাৎ 'এক দেহ' তা থাকল কি?

# মুসলিম উম্মাহর বর্তমান দুরবস্থার প্রকৃত কারণ

# তওহীদ থেকে বিচ্যুতি

শরিফুল ইসলাম

এই দীনুল হকের ভিত্তি হচ্ছে তওহীদ অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কলেমাটি, এ নিয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তওহীদ ব্যতীত কোন ইসলামই হতে পারে না, তওহীদই ইসলামের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মূলভিত্তি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, মুসলিম বলে পরিচিত এই জনসংখ্যাটি তওহীদ সম্পর্কে যে ধারণা করে (আকিদা) তা ভুল। তাদের কাছে তওহীদ মানে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা এবং তাঁর ইবাদত বা উপাসনা করা। 'তওহীদ' এবং 'ওয়াহদানিয়াহ্' এই আরবি শব্দ দু'টি একই মূল থেকে উৎপন্ন হলেও এদের অর্থ এক নয়। 'ওয়াহদানিয়াহ্' বলতে বোঝায় মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ যে একজন তা বিশ্বাস করা (একত্ববাদ-Monotheism), পক্ষান্তরে 'তওহীদ' মানে ঐ এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, তাঁর ও কেবলমাত্র তাঁরই নিঃশর্ত আনুগত্য করা। আরবের যে মোশরেকদের মধ্যে আল্লাহর শেষ রসুল এসেছিলেন, সেই মোশরেকরাও আল্লাহর একত্বে, ওয়াহদানিয়াতে বিশ্বাস করত, কিন্তু তারা আল্লাহর হুকুম, বিধান মানতো না অর্থাৎ তারা আল্লাহর আনুগত্য করত না। তারা তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সামষ্টিক জীবন নিজেদের মনগড়া নিয়ম-কানুন দিয়ে পরিচালনা করত। এই আইনকানুন ও জীবন ব্যবস্থার উৎস ও অধিপতি হিসাবে ছিল বায়তুল্লাহ, কা'বার কোরায়েশ পুরোহিতগণ। মূর্তিপূজারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের এই ঈমান ছিল যে, এ বিশ্বজগতের স্রষ্টা আল্লাহ একজনই এবং তাদের এই ঈমান বর্তমানে যারা নিজেদেরকে মো'মেন মুসলিম বলে জানে এবং দাবি করে তাদের চেয়ে কোন অংশে দুর্বল ছিল না (সুরা যুখরুফ ৯, আনকাবুত ৬১, লোকমান ২৫)। কিন্তু যেহেতু তারা আল্লাহর প্রদত্ত হুকুম মানতো না, তাই তাদের ঐ ঈমান ছিল অর্থহীন, নিষ্ফল এবং স্বভাবতই আল্লাহর হুকুম না মানার পরিণতিতে তাদের সমাজ অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, নিরাপত্তাহীনতা, সংঘর্ষ ও রক্তপাতে পরিপূর্ণ ছিল। এ জন্য আরবের ঐ সময়টাকে আইয়্যামে জাহেলিয়াত বলা হয়। তাদের স্রষ্টা আল্লাহর হুকুমের প্রতি ফিরিয়ে আনার জন্যই তাদের মধ্যে রসুল প্রেরিত হয়েছিলেন। রসুলও সে কাজটিই করেছিলেন, ফলশ্রুতিতে অন্যায় অশান্তিতে নিমজ্জিত সেই সমাজটি নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ শান্তিময় (ইসলাম অর্থই শান্তি) একটি সমাজে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য না করাই ছিল তাদের কাফের মোশরেক হওয়ার প্রকৃত কারণ। বর্তমানের মুসলিমরা উপলব্ধি করতে পারছে না যে প্রাক-ইসলামিক যুগের আরবের কাঠ পাথরের মূর্তিগুলিই এখন গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদির রূপ ধরে আবির্ভূত হয়েছে এবং মুসলিম জনসংখ্যাটি আল্লাহর পরিবর্তে এদের তথা এদের প্রবর্তক ও পুরোধা 'পুরোহিতদের' আনুগত্য করে যাচ্ছে। এই প্রতিটি তন্ত্র আলাদা আলাদা একেকটি দীন (জীবনব্যবস্থা), ঠিক যেমন দীনুল হক 'ইসলাম'ও একটি জীবনব্যবস্থা। পার্থক্য হলো, এই মানবরচিত দীনগুলি মানবজীবনের বিশেষ কিছু অঙ্গনের, বিশেষ কিছু বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে, কিন্তু সঠিক সমাধান দিতে পারে না আর ইসলাম মানবজীবনের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় থেকে শুরু করে সামষ্টিক অঙ্গনের সকল বিষয়ে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা দিয়ে থাকে। বর্তমানের মুসলিম নামক জনসংখ্যাটি এই সকল মানবরচিত তন্ত্রের প্রতিমার আনুগত্য করে সেই পৌত্তলিক আরবদের মতোই মোশরেক ও কাফেরে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর রসুল এসে মোশরেক আরবদেরকে আল্লাহর তওহীদের ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সেখানে আল্লাহর একত্ববাদ (ওয়াহদানিয়াত) প্রতিষ্ঠা করেননি, কারণ আল্লাহর একত্ববাদের বিষয়ে সেই মোশরেকদের আগে থেকেই সুদৃঢ় ঈমান ছিল। তারা তাদের দেবদেবীর কোনটিকেই আল্লাহ মনে করত না, স্রষ্টা বা প্রভুও ভাবত না, তারা সেগুলির পূজা করত এই বিশ্বাসে যে সেগুলি তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করবে এবং তাদের হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে (সুরা ইউনুস- ১৮, সুরা যুমার- ৩)। সুতরাং মূর্তি পূজার নেপথ্যে তাদের প্রকৃত উপাস্য আল্লাহই ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে যে মতবাদগুলির আনুগত্য করা হচ্ছে এর মধ্যে কোথাও আল্লাহর স্থান নেই, এগুলি আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কেই সম্পূর্ণ নির্বিকার। ফলে বর্তমানের মো'মেন মুসলিম হবার দাবিদারগণ যে শেরক ও কুফরে লিপ্ত তা নিঃসন্দেহে ১৪০০ বছর আগের আরবদের শেরক ও কুফরের চেয়েও নিকৃষ্টতর।

এই যে আমি এ বিষয়কে কার্যত শেরক ও কুফর বলছি, আমার এ কথার গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। তবে পাঠককে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার আগে এ বক্তব্যের পক্ষে যে যুক্তিগুলি পেশ করছি সেগুলি একটু গভীরভাবে ভেবে দেখার জন্য। যদি এ জনসংখ্যাটি সত্যিই মো'মেন, মুসলিম ইত্যাদি হয়ে থাকে তাহলে কোর'আনের অনেক আয়াত মিথ্যা হয়ে যায়, যা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন- তোমরা যদি মো'মেন হও তবে পৃথিবীর

কর্তৃত্ব তোমাদের হাতে দেব যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দিয়েছিলাম (সূরা নূর ৫৫)। তাঁর ওয়াদা যে সত্য তার প্রমাণ নিরক্ষর, চরম দরিদ্র, সংখ্যায় মাত্র পাঁচ লাখের উম্মতে মোহাম্মদীর হাতে তিনি অর্ধ্ব-পৃথিবীর কর্তৃত্ব তুলে দিয়েছিলেন। প্রশ্ন হলো, আমরা নিজেদের মো'মেন বলে দাবি করি, তাহলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পৃথিবীর কর্তৃত্ব, আধিপত্য আমাদের হাতে নেই কেন? সেই সর্বশক্তিমান কি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অসমর্থ (নাউযুবিল্লাহে মিন যালেক)? তিনি আরও বলেছেন, তিনি মো'মেনদের ওয়ালী (বাকারা ২৫৭)। ওয়ালী অর্থ- অভিভাবক, বন্ধু, রক্ষক ইত্যাদি। আল্লাহ যাদের ওয়ালী তারা কোনোদিন শত্রুর কাছে পরাজিত হতে পারে? তারা কোনোদিন পৃথিবীর সর্বত্র অন্য সমস্ত জাতির কাছে লাঞ্ছিত, অপমানিত হতে পারে? তাদের মা-বোনরা শত্রুদের দ্বারা ধর্ষিতা হতে পারে? অবশ্যই নয়। এর একমাত্র জবাব হচ্ছে- আমরা যতই নামাজ পড়ি, রোযা রাখি, যত হাজার রকম ইবাদতই করি, যতই মুত্তাকী হই, আমরা মো'মেন নই, মুসলিম নই, উম্মতে মোহাম্মদী হবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

এর কারণ এই জনসংখ্যাটি ইসলামের ভিত্তি থেকেই সরে গেছে। ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, এটাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত এ কলেমাই এই দীনের অপরিবর্তনীয় ভিত্তি যাতে কোনো দিনই "ইলাহ" শব্দটি ছাড়া অন্য কোন শব্দই ব্যবহৃত হয়নি। আল্লাহই আমাদের একমাত্র উপাস্য, স্রষ্টা, পালনকর্তা তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে এগুলি স্বীকার করে নেওয়া এই দীনের ভিত্তি নয়, কলেমা নয়। বরং কলেমা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহকে ইলাহ হিসাবে না মেনে কেউ মো'মেন হতে পারবে না।

কলেমায় ব্যবহৃত 'ইলাহ' শব্দের প্রকৃত অর্থ, 'যাঁর হুকুম মানতে হবে' (He who is to be obeyed)। শতাব্দীর পর শতাব্দীর কাল পরিক্রমায় যেভাবেই হোক এই শব্দটির অর্থ 'হুকুম মানা বা আনুগত্য' থেকে পরিবর্তিত হয়ে হয়ে গেছে 'উপাসনা, বন্দনা, ভক্তি বা পূজা করা (He who is to be worshiped)। যেভাবে 'হেদায়াহ' (সঠিক দিক নির্দেশনা) শব্দটি প্রায়োগিক অর্থে 'তাকওয়া'য় রূপান্তরিত হয়েছে, আকিদা আর ঈমান অভিন্ন বিষয়ে পরিণত হয়েছে ঠিক সেভাবেই ইলাহ শব্দের অনুবাদ পৃথিবীর সর্বত্র মা'বুদ বা উপাস্যে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সারা দুনিয়ায় খ্রিষ্টানদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলিতে কলেমার অর্থই শেখানো হয় - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। কোর'আনের ইংরেজি অনুবাদগুলিতেও কলেমার এই অর্থই করা হয় (There is none to be worshiped other than Allah)। এর ভেতরকার ভুল এবং অসঙ্গতিটি দিবালোকের মত পরিষ্কার। 'উপাস্য' কথাটির আরবি হচ্ছে 'মা'বুদ', তাই "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই" এই বাক্যটিকে আরবি করলে দাঁড়ায় "লা মা'বুদ ইল্লাল্লাহ', যা কখনও ইসলামের কলেমা হয়নি, আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত কোন নবীই এই কলেমা নিয়ে আসেননি, কোন অমুসলিম এই কলেমা পড়ে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই' ঘোষণা দিয়ে মুসলিম হতে পারবে না। এই ভুলের পরিণাম যে কত সুদূরপ্রসারী ও দুর্ভাগ্যজনক দেখুন! কলেমার 'ইলাহ' শব্দটির অর্থ ভুল বোঝার ভয়াবহ পরিণতি এই হয়েছে যে সম্পূর্ণ মুসলিম জনসংখ্যাটি এই দীনের ভিত্তি থেকেই বিচ্যুত হয়ে গেছে, ফলে তারা আর মো'মেন নেই। তারা শুধু যে ইসলামের সীমানা থেকে বহিঃর্গত হয়ে কাফের মোশরেক হয়ে গেছে তাই নয়, এই ভুলের আরও মারাত্মক এক পরিণতি হয়েছে। সেটা হলো 'ইলাহ' শব্দের অর্থ পাল্টে যাওয়ায় এই মুসলিম জনসংখ্যার কলেমা সংক্রান্ত ধারণাই (Conception, আকিদা) পাল্টে গেছে, যে মহাগুরুত্বপূর্ণ আকিদা ভুল হলে সকল ফকীহগণের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, সকল আমল অর্থহীন হয়ে যায়, এমনকি ঈমানেরও কোন মূল্য থাকে না। বর্তমানে এই জাতির আকিদায় আল্লাহর হুকুম মানার কোন গুরুত্ব নেই, তাঁর উপাসনাকেই যথেষ্ট বলে মনে করা হচ্ছে। কলেমার অর্থ সম্পর্কে এই ভুল আকিদা এই জনসংখ্যার আত্মায় এবং অবচেতন মনে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে। ফলে সারা দুনিয়াতে এমন কোন দল নেই, এমন কোন রাষ্ট্র নেই যারা তাদের সামষ্টিক, জাতীয় জীবনে আল্লাহর হুকুম মেনে চলছে, যা কিনা ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানার চেয়ে বহুগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। জাতীয় জীবনে আল্লাহকে অমান্য করে তার বদলে উপাসনা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি দিয়ে আসমান জমিন ভর্তি করে ফেলা হচ্ছে, কিন্তু সেই পর্বত সমান উপাসনাও বিশ্বময় তাদের করুণ দুর্শশার প্রতি দয়াময় আল্লাহর কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হচ্ছে, বিজাতির হাতে তাদের অবর্ণনীয় নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, পরাজয়, অপমান, নিগ্রহ বন্ধ তো হচ্ছেই না, বরং দিন দিন আরো বেড়ে চলছে।

'ইলাহ' শব্দের অর্থ যে 'আনুগত্য করা', উপাসনা করা নয় তা কোর'আনের বহু আয়াত থেকে বোঝা যায়। সূরা ফাতাহ'র ১৭নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'যে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' এখানে জান্নাতে যাওয়ার পূর্বশর্ত আল্লাহ দিলেন, যে আনুগত্য করে, বললেন না যে, 'ইবাদত, উপাসনা করে।' এখানে তিনি অন্য কোন আমলের কথাও বললেন না, না সালাহ কায়েম, না যাকাত প্রদান, না হজ্ব, না সওম, অন্যান্য ছোটখাটো আমলের তো কথাই নেই। তিনি জান্নাত প্রদানের ওয়াদা করলেন শুধুই তাঁর এবং তাঁর রসুলের আনুগত্যের বিনিময়ে। সূরা নেসার ৬৯নং আয়াতটি দেখুন, আল্লাহ বলছেন, 'যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের হুকুম মান্য করবে সে নবী, শহীদ, সিদ্দিক ও সালেহীনদের সঙ্গে (অর্থাৎ জান্নাতে) থাকবে।' এখানেও 'আনুগত্য করা' ছাড়া আর কোন শর্ত আল্লাহ দেন নি। সুতরাং কলেমায় ব্যবহৃত 'ইলাহ' শব্দের অর্থ 'উপাস্য' হওয়া সম্ভব নয়, এর অর্থ অবশ্যই 'যার আনুগত্য করা হয়, হুকুম পালন করা হয়'। আল্লাহর দাবি হচ্ছে, প্রথমে মানুষকে এই অঙ্গীকারে

আবদ্ধ হতে হবে যে আল্লাহ যা হুকুম করবেন তাই সে মেনে নিবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে। তারপর এই চুক্তি বাস্তবায়নকল্পেই সে আল্লাহর ইবাদত করতে বাধ্য, কারণ আল্লাহর হুকুম হচ্ছে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা। তাহলে বোঝা গেল, প্রথম কাজ আল্লাহর আনুগত্য মেনে নেওয়া, তারপরে তাঁর ইবাদত করা। সূরা আম্বিয়ার ২৫ নং আয়াতটি দেখুন, আল্লাহ বলছেন, "আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, সুতরাং তাঁর ইবাদত করো।" যদি ইবাদত করাই প্রথম ও প্রধান কাজ হতো তাহলে আয়াতটি হতো এমন যে, "আল্লাহ ছাড়া মা'বুদ (ইবাদত, বন্দনা পাওয়ার অধিকারী) কেউ নয়, সুতরাং তাঁরই আনুগত্য করো", আরবিতে লা মা'বুদ ইল্লাল্লাহ, ফা আত্তাবিয়্যুহু। কিন্তু কোর'আনে এমনটা একবারও বলা হয় নি। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ 'ইলাহ' এবং 'মা'বুদ' শব্দ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন কারণ এদের অর্থও সম্পূর্ণ আলাদা।

মোটকথা, এই ১৫০ কোটির জনসংখ্যাটি, যারা নিজেদেরকে কেবল মুসলিমই নয়, একেবারে মো'মেন ও উম্মতে মোহাম্মদী বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, তারা এগুলির কোনোটিই নয়, তারা কার্যত শেরক এবং কুফরে নিমজ্জিত। আল্লাহ বলছেন, 'আল্লাহ যা নাযেল করেছেন সে অনুযায়ী যারা হুকুম (বিচার ফায়সালা) করে না তারা কাফের, জালেম, ফাসেক (সূরা মায়েদা ৪৪, ৪৫, ৪৭)। এই আয়াতগুলিতে 'হুকুম' শব্দটি দিয়ে কেবল আদালতের বিচারকার্যই বোঝায় না, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অর্থাৎ সামগ্রিক জীবন তাঁর নাযেল করা বিধান অর্থাৎ কোর'আন (এবং সুন্নাহ) মোতাবেক পরিচালনা করাকেও বোঝায়। মো'মেন মুসলিম হবার দাবিদারগণ এখন আর একটি সু-সংহত উম্মাহরূপে নেই, তারা ভৌগোলিকভাবে পঞ্চাশটিরও বেশি জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান, ইহুদি ও পৌত্তলিকদের দাসে পরিণত হয়েছে। তাই তারা তাদের সামষ্টিক কার্যাবলী আল্লাহর নাযেলকৃত বিধান দিয়ে ফায়সালা করে না। ফলশ্রুতিতে তারা ফাসেক (অবাধ্য), জালেম (অন্যায়কারী) এবং কাফেরে (প্রত্যাখ্যানকারী) পরিণত হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত বিধানগুলিকে অপাংক্তেয় করে রেখে তারা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আইন, কানুনগুলি নিজেদের দেশে প্রবর্তন করে তা দিয়ে সামষ্টিক কার্যাবলী পরিচালনা করছে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি যে তওহীদ ও দীন যে দুটি ভিন্ন বিষয় এবং এ দুটির তফাৎ কি। তওহীদ হচ্ছে ভিত্তি এবং দীন হচ্ছে এই ভিত্তির উপর নির্মিত অবকাঠামো, দালান। তওহীদ হচ্ছে, "একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করা এবং প্রতিটি বিষয়ে তাঁর হুকুমের আনুগত্য করা। সংক্ষেপে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর ও তাঁর রাসূলের হুকুম মানা, প্রতিটি বিষয়ে যেখানেই তাঁর কোন বক্তব্য আছে তা বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া। যে বিষয়ে তাঁর অথবা তাঁর রসুলের কোন বক্তব্য নেই সে বিষয়ে, তা ব্যক্তিগত হোক বা সমষ্টিগত, আমরা স্বাধীনভাবে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।"

আল্লাহর প্রতি লাখো কোটি শুকরিয়া যে তিনি আবার এই হারিয়ে যাওয়া তওহীদ ও সত্যদীনের প্রকৃত আকিদা যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ২০০৮ এর ২ ফেব্রুয়ারি আল্লাহ বিরাট এক মো'জেজার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হেযবুত তওহীদ হচ্ছে আল্লাহর সেই মনোনীত দল যার মাধ্যমে সারা দুনিয়ার সকল অন্যায় অশান্তি নির্মূল হয়ে অনাবিল শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশা'আল্লাহ।

# সওম পালন কি অর্থবহ হচ্ছে?

ওবায়দুল হক

সওম আরবি শব্দ যার অর্থ আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self Control)। আমাদের দেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরান অঞ্চলে অধিকাংশ মানুষই সওমকে রোযা বলে থাকে। রোযা হলো ফার্সি শব্দ যার অর্থ উপবাস থাকা। আত্মসংযম আর উপবাস মোটেও এক জিনিস নয়। সওম কেবল পানাহার বর্জন নয়, বরং সমস্ত রকম ভোগ থেকে নিজেকে আত্মসংযমী করবার কার্যকরী প্রশিক্ষণ। এ কারণে রসুলাল্লাহ এবং সাহাবী ও তাবে-তাবেয়ীনদের যুগে রমজান মাসে বাজার দর সবচেয়ে মন্দা যেত। পণ্যসামগ্রীর চাহিদা থাকত সবচেয়ে কম। তাঁরা কেনাকাটা না করে ঘুরে ঘুরে গরীব দুঃখীদের দান সদকা করতেন। আর বর্তমানে রমজান মাস আসলেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এ মাসে খাওয়া দাওয়া বাবদ অধিকাংশ মানুষের ব্যয়ও হয় অন্য মাসের কয়েকগুণ। সংযমের মাস এলেই মুসলিম নামক জাতির সংযমের সব বাঁধ যেন ভেঙ্গে যায়। কি নিদারুণ পরিহাস!

## সওম (রোযা) কার জন্য ফরজ?

মহান আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলেছেন, "হে মো'মেনগণ, তোমাদের উপর সওম (রোযা) ফরজ

করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" (সুরা বাকারা- ১৮৩)। সওমের নির্দেশ কোর'আনের এই একটি আয়াতেই এসেছে। এই নির্দেশ কাদের জন্য? আল্লাহ পরিষ্কার বলেই দিলেন, সওম মো'মেনদের জন্য। তাহলে আগে জানতে হবে মো'মেন কাকে বলে?

## মো'মেন কাকে বলে?

মহান আল্লাহ বলেন, "মো'মেন শুধুমাত্র তারা যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের উপর ঈমান আনে, পরে কোনো সন্দেহ পোষণ করে না, সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় (সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য) সর্বাত্মক সংগ্রাম, প্রচেষ্টা (জেহাদ) করে।" (সুরা হুজরাত- ১৫)।

## সওম (রোযা) কেন রাখবেন?

মহান আল্লাহ সওমের আদেশ কেন দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আয়াতেই বিষয়টি পরিস্কার। আল্লাহ বলেন– "তোমাদের ওপর সওম ফরজ করা হলো যেন তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার।" আরবিতে ব্যবহার করছেন "লা'আল্লাকুম তাত্তাকুন"। এখন আমাদের বোঝা দরকার তাকওয়া কী? তাকওয়া শব্দের অর্থ সাবধানে পথচলা, সতর্কতার সাথে পথচলা অর্থাৎ যে বিষয়ে আল্লাহর কোনো আদেশ আছে সেটা করা আর যে বিষয়ে কোনো নিষেধ আছে সেটা না করা। আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা বা না করাই হচ্ছে তাকওয়া। এই যে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণে রেখে, তাঁর আদেশ নিষেধ মোতাবেক চলা, এটা সহজ বিষয় নয়। এর জন্য দরকার আত্মার শক্তি, আত্মিক বল। সেই আত্মার শক্তি অর্জনের জন্যই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, ঠিক যেভাবে যথাযথ প্রশিক্ষণ ছাড়া আত্মার শক্তি অর্জন হবে না। ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি নিরূপণ করে অতঃপর ন্যায়, সত্য এবং বৈধ পন্থা গ্রহণ করাই হলো তাকওয়া। ব্যক্তি যদি তাকওয়া অর্জন করতে পারে তবে সমাজ তথা রাষ্ট্রে কোনো প্রকারেই অন্যায়, অবৈধ প্রতিষ্ঠা পাবে না। সত্য প্রতিষ্ঠায় সামষ্টিক প্রশিক্ষণ হচ্ছে সালাহ (নামাজ)। সালাহ জাতীয় ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ইত্যাদি শিক্ষা দেয় আর সওম (রোযা) সংযম শিক্ষা দেয়। চরিত্র অর্জনের জন্য এই প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। যেমন- যে মানুষটি কোনোদিন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণই করে নাই তাকে যদি ম্যারাথন দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেওয়া হয় তবে সে কোনোক্রমেই উত্তীর্ণ হতে পারবে না কারণ এই জন্য তার প্রশিক্ষণ দরকার, দম থাকার দরকার। শরীরের মেদ পাতলা হওয়ার জন্য, হাড়ের গিঁটগুলি সাবলীল রাখার জন্য যে লোক নিয়মিত দৌড়ের প্রশিক্ষণ নেবে সেই কেবল পারবে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে; কাজেই মানুষের জীবন চলায় আল্লাহর আদেশ মানা না মানার ক্ষেত্রে আত্মার যে শক্তির প্রয়োজন তার জন্যও প্রশিক্ষণ দরকার। মহান আল্লাহ তাঁর নিখুঁত জীবনব্যবস্থায় মো'মেনদের জন্য বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রেখেছেন। মানুষ স্বভাবতই শরীরের পূজারি, সে ভোগ করতে চায়। কিন্তু সওমের মাধ্যমে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে সে না খেয়ে, জৈবিক চাহিদা পূরণ না করে তার আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, শরীরকে ভোগসর্বস্ব, বস্তুসর্বস্ব হতে না দেওয়ার ক্ষেত্রে আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কেন করবে? আল্লাহর হুকুম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানার জন্য। এই যে আল্লাহর হুকুম পালন করতে গিয়ে মো'মেনগণ না খাওয়ার, উপোস থাকার, জৈবিক চাহিদা পূরণ না করার প্রশিক্ষণ নিল তা দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে, আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার অধীনে বসবাস করতে গিয়ে না খেয়ে থাকার দরকার হলে, কামনা বাসনা পূরণের অভাব দেখা দিলে বা অন্য কোনো প্রয়োজন পূরণের অভাব দেখা দিলে সে যেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সংযত রাখতে পারে, আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলতে পারে; এটাই তাকওয়া, এই তাকওয়া অর্জনের জন্যই প্রশিক্ষণ হচ্ছে সওম। সওম শব্দের অর্থই হচ্ছে আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self Control). বর্তমানে সওমকেই রোযা বলা হয় কিন্তু রোযার অর্থ শুধু উপবাস থাকা।

সওম হলো মো'মেনদের জন্য, যে মো'মেন নয় তার সওম রাখা অর্থহীন। আল্লাহর দেওয়া সংজ্ঞা মোতাবেক আমরা জাতিগতভাবে মো'মেন আছি কি না তা আগে ভাবতে হবে। আল্লাহ বললেন- মো'মেনরা আল্লাহর রাস্তায় (আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠার জন্য) জীবন ও সম্পদ দিয়ে সংগ্রাম করবে আর আমরা জাতিগতভাবে আল্লাহর হুকুম প্রত্যাখ্যান করে ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতা (!) তথা দাজ্জালের হুকুম মেনে নিয়ে তার দাসত্ব করে যাচ্ছি। যেহেতু আমরা আল্লাহর সংজ্ঞা মোতাবেক জাতিগতভাবে মো'মেনই না কাজেই আমাদের সওম তো না খেয়ে থাকাই হচ্ছে। এ কারণেই রসুলাল্লাহ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, "এমন সময় আসবে যখন মানুষ সওম রাখবে কিন্তু তা হবে না খেয়ে থাকা, রাত জেগে নামাজ পড়বে কিন্তু তা হবে কেবল ঘুম নষ্ট করা (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ হবে না)। (ইবনে মাজাহ, আহমাদ, তাবারানী, দারিমি, মেশকাত)।"

# ‘বিস্ময় বোলার’ মুস্তাফিজ

এম চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি লড়াইয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আর সানরাইজার্স হায়দারাবাদ। টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নামে বেঙ্গালুরু। রানের বন্যা বসে যায় মাঠজুড়ে। গ্যালারিজুড়ে তখন বেঙ্গালুরু সমর্থকদের বাঁধভাঙ্গা উল্লাস। তবে কিছুক্ষণ পর পরই স্তিমিত হয়ে পড়ছিল রানের এই উল্লাস। কারণ আর কেউ নয়, এবারের আইপিএলে অভিষেক হওয়া একজন বোলার। যে ম্যাচে মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে ২১৮ রানের পাহাড়সম স্কোর গড়ে বেঙ্গালুরু, সেই ম্যাচেই ৪ ওভার বোলিং করে মাত্র ২৬ রানের বিনিময়ে এই বোলার তুলে নেন ২টি মূল্যবান উইকেট। বলছি বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ‘বিস্ময় বোলার’ মুস্তাফিজুর রহমানের কথা। এমনই এক উজ্জ্বল সূচনার মধ্য দিয়ে আইপিএল-২০১৬ আসরে অভিষেক ঘটে টাইগার বোলার ‘কাটার মাস্টার’ মুস্তাফিজের। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি তাকে। একের পর এক সাফল্যে নিজের ক্যারিয়ার সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি দলকে নিয়ে যান ফাইনালে। আর ফাইনালেও দলের জয়ে নিজের উপস্থিতিকে করেন আলোময়।

প্রথমবারের মত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) খেলতে গিয়েই শিরোপা জিতেছেন টাইগার দলের অন্যতম প্রিয়মুখ মুস্তাফিজুর রহমান। যেখানে বিশ্বের সব খ্যাতনামা ব্যাটসম্যানরা তাদের ব্যাটে রানের বন্যা বসিয়ে দেন, সেখানে মিতব্যয়ী বোলিং আর দারুণ সব কাটারে ব্যাটসম্যানদের পরাস্ত করেই একের পর এক আনন্দে মাতেন বাংলাদেশের সাতক্ষীরার ছেলে মুস্তাফিজ। তার অসাধারণ বোলিং নৈপুণ্যে সানরাইজার্স হায়দারাবাদ পায় ট্রফি জয়ের স্বাদ। আইপিএলে দলের প্রথম ম্যাচ থেকেই হায়দারাবাদের বোলিং অ্যাটাকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যান মুস্তাফিজ। ইনজুরির কারণে কেবল একটি ম্যাচেই মাঠের বাইরে থাকতে হয় তাকে। বাংলাদেশের ক্রিকেট দলে তার অনবদ্য পারদর্শিতা শুরু থেকেই বিশ্বের ক্রিকেটামোদীদের নজর কেড়েছিল। এরই ধারাবহিকতায় এই বোলারকে নিলামে ১ কোটি ৪০ লক্ষ রুপির বিনিময়ে নিজেদের দলে ভেড়ায় সানরাইজার্স হায়দারাবাদ। আর নিজেকে প্রমাণ করার এই সুযোগ বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছেন মুস্তাফিজ, গড়েছেন একের পর এক কীর্তি।

এবারের আইপিএলের মুস্তাফিজের বোলিংয়ের সেই কীর্তিগুলি দেখে নেওয়া যাক-

১) ১৬ ম্যাচে ১৭ উইকেট নিয়ে সদ্যসমাপ্ত আইপিএলে সর্বাধিক উইকেট পাওয়া বোলারদের তালিকায় মুস্তাফিজ রয়েছেন ৫ নম্বরে। এ তালিকায় প্রথমে রয়েছেন তারই সতীর্থ ভুবনেশ্বর কুমার।

২) এক ইনিংসে বোলিংয়ে সব থেকে কম স্ট্রাইক রেটের বোলারদের তালিকাতে ১৯ নম্বরে
রয়েছেন মুস্তাফিজ। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে ম্যাচে ৩ ওভার বল করে ১৬ রান দিয়েছিলেন তিনি যেখানে তার স্ট্রাইক রেট ছিল মাত্র ৬।

৩) পুরো টুর্নামেন্টের সব থেকে কম স্ট্রাইক রেটের বোলারদের তালিকাতে মুস্তাফিজের অবস্থান ২৯ নম্বরে। ১৬ ম্যাচে ৪২১ রান দিয়েছেন মুস্তাফিজ। যেখানে তার স্ট্রাইক রেট ২১.৫২।

৪) পুরো টুর্নামেন্টের সব থেকে কম ইকোনমির তালিকায় মুস্তাফিজ রয়েছেন ৭ নম্বরে। ১৬ ম্যাচে তার ইকোনমি ৬.৯০। কিন্তু ১০ বা তার বেশি ইনিংসে বোলিং করা বোলারদের ভেতর মুস্তাফিজ রয়েছেন তালিকার শীর্ষে।

৫) ম্যাচে সব থেকে কম ইকোনমির তালিকাতে

মুস্তাফিজ রয়েছেন ৪ নম্বরে। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বিপক্ষে ৪ ওভার বল করে ৯ রান দিয়েছিলেন এই কাটার মাস্টার। যেখানে তার ইকোনমি ছিল ২.২৫। ওই ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচও হয়েছিলেন তিনি।

৬) এক ইনিংসে ১৭টি ডট বল দিয়ে আইপিএলের এক ম্যাচে সর্বাধিক ডট বল দেওয়ার তালিকায় তিনি রয়েছেন দুই নম্বরে।

৭) পুরো আইপিএল টুর্নামেন্টে ১৩৭টি ডট বল দিয়ে সর্বাধিক ডট বল দেওয়ার তালিকায় মুস্তাফিজ রয়েছেন দুই নম্বরে।

৮) ১৬টি ম্যাচে ১টি মেইডেন ওভার করে আইপিএলে সর্বাধিক মেডেন ওভার করা বোলারদের তালিকায় মুস্তাফিজ রয়েছেন ষষ্ঠ স্থানে (স্ট্রাইক রেটে এগিয়ে থেকে)।

৯) পুরো টুর্নামেন্টে বল প্রতি উইকেট নেওয়ার তালিকাতে মুস্তাফিজ রয়েছেন ২৩ নম্বরে। ১৬ ম্যাচে মুস্তাফিজের গড় ২৪.৭৬।

উল্লেখ্য, ভারতের সেরা এই টি-২০ আসরে প্রথমবার খেলতে গিয়েই এমন ঈর্ষনীয় সাফল্যের কারণে সিরিজ শেষে সেরা উদীয়মান ক্রিকেটারের পুরস্কারও জেতেন 'দ্যা ফিজ'।

২৫ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পা দেওয়া মুস্তাফিজের ক্রিকেট ক্যারিয়ারটা খুব বেশি দিনের নয়। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও অভিষেক স্বল্পদিনেরই। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে খুলনার হয়ে আট ম্যাচ খেলে তিনি পেয়েছেন ২৩ উইকেট। আর বিসিএলে দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে পেয়েছেন ৫ উইকেট। মোট ১০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ২১.১৭ গড়ে তার উইকেটসংখ্যা ২৮। ছোট্ট ক্যারিয়ারের এমন উজ্জ্বল পরিসংখ্যান ক্রিকেট ইতিহাসে দুর্লভ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের প্রথম ম্যাচে (টি-২০) পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্যুতি ছড়ান মুস্তাফিজ। তুলে নেন মারকুটে ব্যাটসম্যান শহীদ আফ্রিদির উইকেটটি। টি টোয়েন্টির মতো ওয়ানডেতেও মুস্তাফিজের অভিষেক ছিল বর্ণীল। ওয়ানডে ক্রিকেটের অভিষেক ম্যাচেই তরুণ এই পেসার তুলে নিয়েছিলেন দু'টি ডাবল সেঞ্চুরির মালিক ভারতের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মার উইকেটটি। গত বছরের ১৮ জুন মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ভারত-বাংলাদেশ ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে রোহিতসহ পাঁচ উইকেট নেন মুস্তাফিজ। ওই ম্যাচে বাংলাদেশের বিজয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি তিনি হন ম্যান অব দ্য ম্যাচ।

আর দশটা মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো তার মা-বাবারও স্বপ্ন ছিল ছেলে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হোক, সফল হোক। কিন্তু শিশুকাল থেকে তার মন পড়ে থাকত ক্রিকেটের ব্যাট আর বলের দিকে। এতে পরিবারের সবার ছিল ঘোর আপত্তি। ব্যাট-বল কেড়ে নিয়ে তাকে জোর করে বসানো হতো পড়ার টেবিলে। খেলতে না দিলে কান্নাকাটি করে সবাইকে অস্থির করে তুলতেন তিনি। তখন হয়ত কেউই ভাবতে পারেনি, একদিন এই ছেলেটিই বাংলাদেশের ক্রিকেট অঙ্গনকে রাঙ্গিয়ে আলো ছড়াবেন আইপিএলের মতো জমজমাট আসরেও।

সাতক্ষীরা সদর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণে কালীগঞ্জ উপজেলার তারালি ইউনিয়নের তেঁতুলিয়া গ্রামে মুস্তাফিজের বাড়ি। তার জন্ম ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বরে। চার ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সবার ছোট তিনি। পরিবারের সব প্রতিকূলতার মধ্যে মুস্তাফিজের পাশে এসে দাঁড়ান তার সেজো ভাই মোখলেছুর রহমান। তিনিই নিজ হাতে গড়ে তুলেছেন আজকের মুস্তাফিজকে। মোখলেছুর রহমান জানান মুস্তাফিজের ক্রিকেটার হয়ে ওঠার গল্প। তিনি ও মেজো ভাই জাকির হোসেন গ্রামে টেনিস বলে ক্রিকেট খেলতেন। ১০-১২ বছর বয়স থেকে মুস্তাফিজও তাদের সঙ্গী হন। গ্রামের তেঁতুলিয়া মাঠের এক খেলায় তারা তিন ভাই-ই খেলছিলেন। তখন মুস্তাফিজ ব্যাটিং করতে ভালোবাসতেন। প্রতিপক্ষের একজন ব্যাটসম্যানকে কিছুতেই আউট করা যাচ্ছিল না। মুস্তাফিজের হাতে তিনি তুলে দেন বল। প্রথম বলেই মুস্তাফিজ প্রতিপক্ষের

আইপিএল ২০১৬ আসরে মুস্তাফিজের শিকার ক্যারিবীয় তারকা ব্যাটসম্যান আন্দ্রে রাসেল।

সেই অপ্রতিরোধ্য ব্যাটসম্যানকে আউট করেন। তারপর তিনি বোলার হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েন। বরেহা মিলনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি করার পরপরই যাতে বাইরে খেলাধুলা করতে যেতে না পারেন, এ জন্য বাড়িতে দেওয়া হয় চারজন প্রাইভেট শিক্ষক। কিন্তু স্কুল পালিয়ে তিনি চলে যেতেন ক্রিকেট মাঠে। মোখলেছুর বলেন, "আমার বন্ধু মিলনের পরামর্শে সাতক্ষীরা গণমুখী ক্লাবের ক্রিকেট কোচ আলতাফ ভাইয়ের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো। আলতাফ ভাইয়ের পরামর্শে মুস্তাফিজ সাতক্ষীরা স্টেডিয়ামে অনূর্ধ্ব-১৪ প্রাথমিক বাছাই-এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং উত্তীর্ণ হয়। তারপর সাতক্ষীরায় ক্রিকেট একাডেমির মুফসসিনুল ইসলামের কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু হয়।" মোখলেছুর রহমান প্রতিদিন ভোর রাতে তেঁতুলিয়া থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে মোটরসাইকেলে করে সাতক্ষীরা নিয়ে আসতেন প্রশিক্ষণের জন্য। অনূর্ধ্ব-১৪ হয়ে অনূর্ধ্ব-১৭ দলে খেলে ধারাবাহিকভাবে সফল হন মুস্তাফিজ। এরপর তিনি চলে আসেন ঢাকার শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ফাস্ট বোলিং ক্যাম্পে ট্রায়াল দিতে। সেখানে এসে কোচদের নজর কাড়েন। এরপর অনূর্ধ্ব-১৯ এ খেলেছেন নিয়মিত।

মুস্তাফিজের আরও যেসব অর্জন-

* ওয়ানডে সিরিজে অভিষেক ম্যাচে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার যৌথ বিশ্ব রেকর্ড মুস্তাফিজের।
* ৩ ম্যাচের সিরিজে অভিষেকে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার একক বিশ্ব রেকর্ডও তার।
* ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার একক বিশ্ব রেকর্ডটিও তারই।
* ব্রায়ান ভিটোরির পর ওয়ানডে ইতিহাসের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে ক্যারিয়ারের প্রথম দুই ম্যাচেই ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়ে রেকর্ড গড়েন এই বোলার।
* প্রথম দুই ম্যাচে ১১ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ক্যারিয়ারের প্রথম দুই ওয়ানডেতে এটাই সর্বোচ্চ, ভিটোরির ছিল ১০ উইকেট।
* আন্তর্জাতিক টি টেয়েন্টিতে সবচেয়ে মিতব্যয়ী বোলিংয়ের রেকর্ডও মুস্তাফিজের ঝুলিতে।
* মাশরাফি-রুবেলের পর তৃতীয় বাংলাদেশি হিসেবে ইনিংসে ৬ উইকেট নেওয়া বোলার তিনি।
* প্রথম বাংলাদেশি পেসার হিসেবে টি টোয়েন্টিতে ৫ উইকেট, প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ইডেন গার্ডেনে ৫ উইকেট পান তিনিই।
* সবচেয়ে কম বয়সী বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে ৫ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব দেখান মুস্তাফিজ। ওই ম্যাচে টাইগারদের প্রতিপক্ষ ছিল নিউজিল্যান্ড।
* বিশ্বের একমাত্র বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে ৪ জন ব্যাটসম্যানকে বোল্ড করেছেন এই কাটার মাস্টার।
* বিশ্বের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে অভিষেকেই টেস্ট ও ওয়ানডেতে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হয়েছেন তিনি।

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে আইসিসির বর্ষসেরা একাদশে ঠাই পান তিনি। অভিষেকে এমন কীর্তি এই প্রথম।


# ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা

মাত্র কয়েক লাখের উম্মতে মোহাম্মদী অর্ধ পৃথিবীজুড়ে কী অনাবিল শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল! আজ আমরা ১৬০ কোটি হয়েও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা ঐক্যবদ্ধই হতে পারছি না। কেন? আসল সমস্যা কোথায়?

হেযবুত তওহীদ
মানবতার কল্যাণে নিবেদিত
www.hezbuttawheed.org

০১৭৮২১৮৮২৩৭ | ০১৬৭০১৭৪৬৪৩
০১৭১১০০৫০২৫ | ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫

কেন উম্মতে মোহাম্মদীর সৃষ্টি ও উত্থান হয়েছিল, কেমন ছিলেন সেই বিশ্বজয়ী উম্মাহ, কী ছিল তাদের আকিদা, আর আজ কেন সেই জাতি বিশ্বের সকল জাতির গোলাম? দুনিয়াজোড়া কেন এই দুর্গতি? কিভাবে এই দুর্গতি থেকে জাতির পরিত্রাণ ঘটবে– এমন সব বৃহৎ প্রশ্নের সহজ সমাধান পাওয়া যাবে এ বইটিতে।